শনিবারের চিঠি

২৮ আষাঢ় ১৩৯২ □ ১৩ জুলাই ১৯৮৫

ব্যাংক
অব বরোদা
না
ব্যাংক
অব বৃন্দাবন

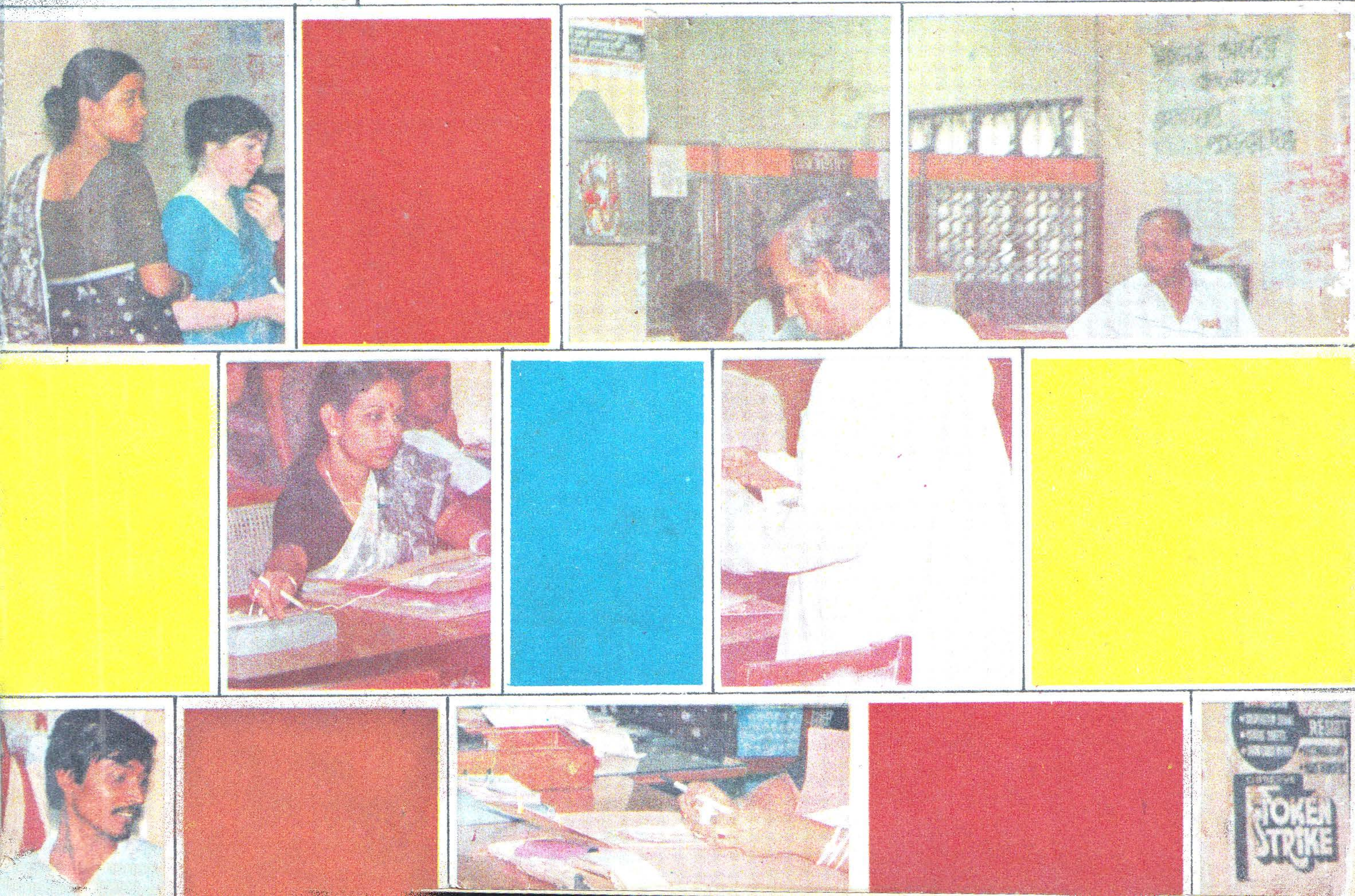

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান ঃ রূপালী গোশাভী

হার্ডকপি ও এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

বিবাহযোগ্য পাত্র–পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি–১ ফোনঃ ২৩–৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র–পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র–পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রে Exclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র–পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার । যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

–আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

উন্নত বর্ণশিল্পকলা যা এর পেছনে কাজে লাগান হয়েছে তা আপনার নজরে আসবে না

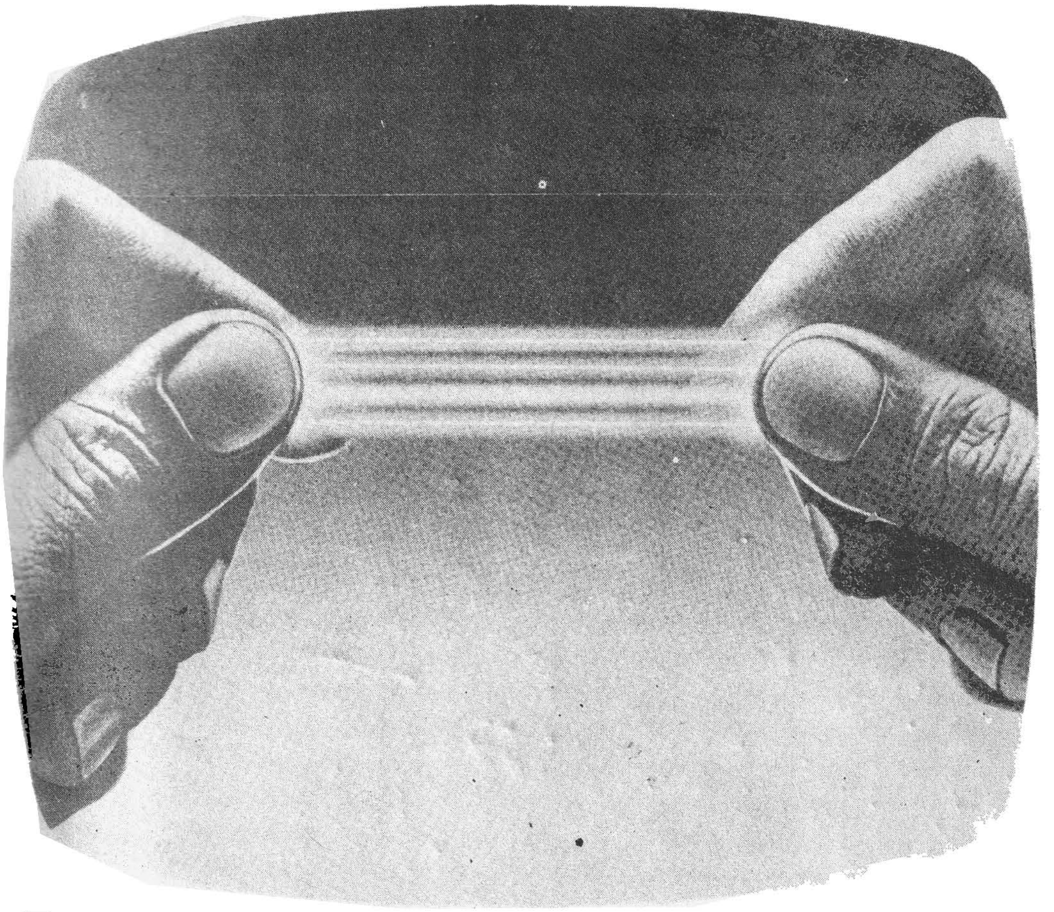

কিন্তু আপনার চোখের সামনে দেখতে পাবেন এক জীবন্ত বর্ণ সুষমা

কালার মেটিক সুপার এবং নতুন কালার ক্রোম আপনার দখলে আসার পর সোনোডাইন টেলিকালার এর নিয়ন্ত্রিত উজ্জ্বলতার সাথে আপনার চোখকে পরিচিত করান।

সর্বাধুনিক পিকচার টিউব শিল্পকলা প্রবর্তন করার ফলে, এই উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন মডেল দুইটি বর্ণশিল্পকলার ক্ষেত্রে অধিক প্রাণের সঞ্চার করেছে

এই নতুন পিকচার টিউবটিতে অধিকতর আলোকিত ফসফরাস থাকার ফলে বর্ণের প্রভা আরও উজ্জ্বল দেখায়

এতে একটি ইন-লাইন ইলেকট্রন বীমগান লাগান আছে যা ছবির বাইরের রেখাকে তীক্ষ্ণ করে, ফলে ফোকাসও প্রখর হয়। এ জন্য বর্ণ হয়ে ওঠে জীবন্ত আপনার চোখের সামনে আর ঘরকে করে তোলে আকর্ষণীয়।

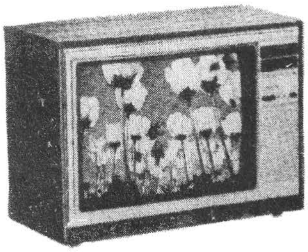

কালার ক্রোম ৫১ সে.মি.

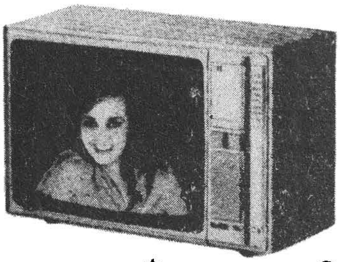

কালার মেটিক সুপার ৫১ সে.মি.

চোখে নজরে আসার থেকেও বেশী উচ্চ শিল্পকলা এতে গঠন করা হয়েছে। যথা ইলেকট্রনিক মেমোরি টিউনিং যার ফলে শুধুমাত্র সুইচটি স্পর্শ করা মাত্রই আপনার পছন্দমত পূর্বনির্ধারিত স্টেশনটি টি ভি স্ক্রীনে ফুটে উঠবে।

এবং কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরী কাঠামো—যার ফলে খারাপ হওয়ার অনুপাত খুবই কম।

এখন আপনার নিজের জন্য একটি টেলিকালার পরীক্ষা করে নির্বাচিত করার এই কি সঠিক সময় না!

সোনোডাইন টেলিকালার

যার স্থান বর্ণশিল্পকলার সর্বাগ্রে

Dataram-ST-2/85 BEN

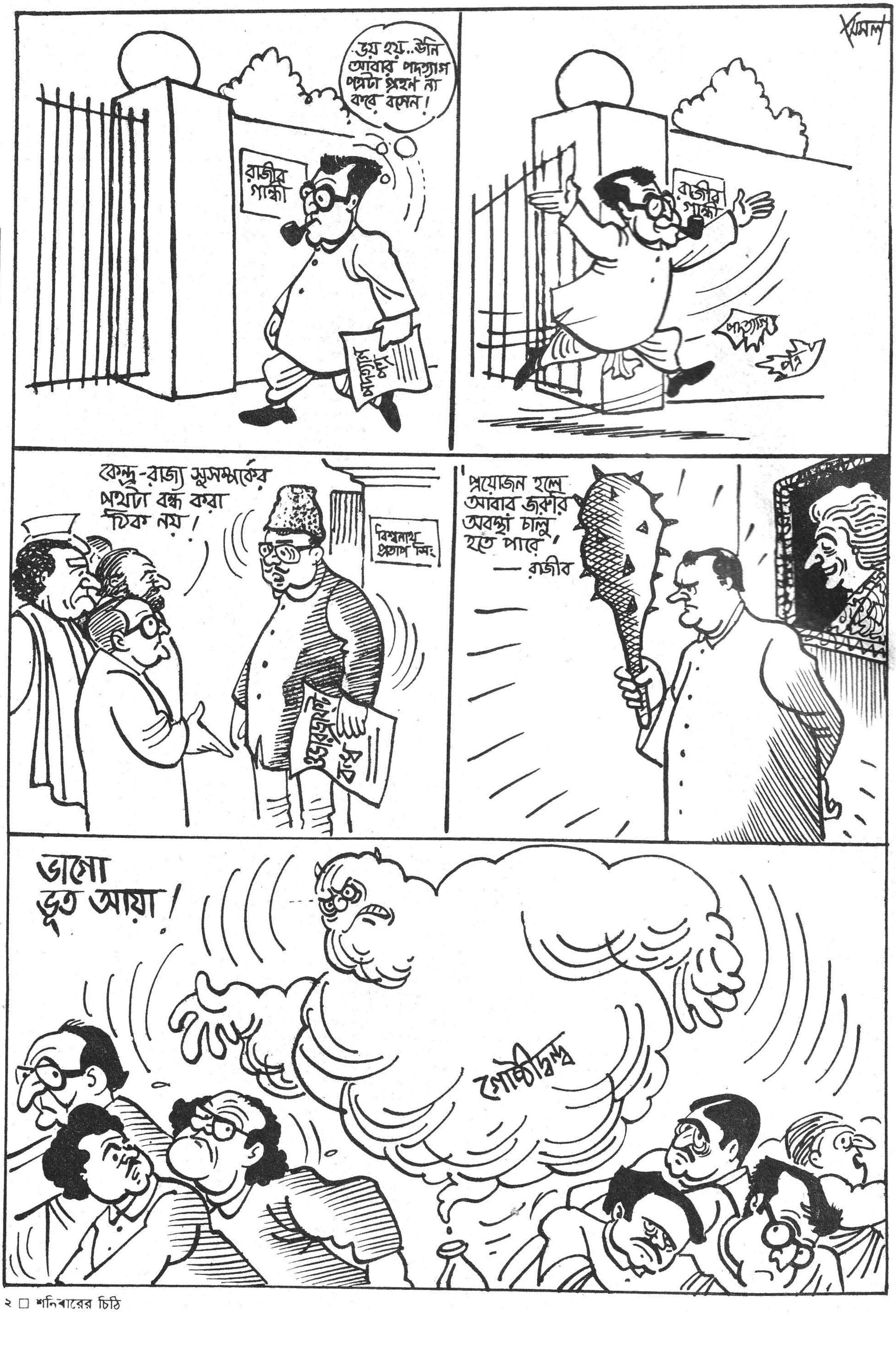
ভয় হয়..উনি আবার পদত্যাগ পত্রটা গ্রহণ না ক'রে বসেন!
রাজীব গান্ধী
রাজীব গান্ধী
পদত্যাগ
পত্র
কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্কের পথটা বন্ধ করা ঠিক নয়!
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং
প্রয়োজন হলে আবার জরুরি অবস্থা চালু হতে পারে'
— রাজীব
ভাগো ভূত আয়া!
গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সূচীপত্র

কার্টুন ● ২

চিঠিপত্র ● ৪

প্রচ্ছদ কাহিনী

ব্যাংক অব বরোদা না ব্যাংক অব বৃন্দাবন ● বিশেষ প্রতিনিধি ১২

বিশেষ রচনা

রেবা ঘোষের প্রাণনাশের চেষ্টা ● গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫

সি. পি. এম-এ বসু-বাসবপুন্নিয়া জোট? ● বিশেষ প্রতিনিধি ১১

ধারাবাহিক

কিছু স্মৃতি কিছু কথা ● গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ২১

মরজি মহল ● বনফুল ৭

পুনশ্চ

গল্প : সুবাস ● প্রভাত দেবসরকার ৩৩

গল্প

স্বপ্নের বাঁশিওয়ালা ● দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

দেখা — অজয় দাশগুপ্ত ৩৭

রম্যরচনা

পথ পথেই হারায় মন হারায় মনে ● বিনয়েন্দু চক্রবর্তী ৫

লেখকের মৃত্যু — সুনীল চট্টোপাধ্যায় ৩৯

যুদ্ধ ও শান্তি — দীপক বসু ৪০

ফিচার

সাদা চোখে ● দিশাহারা শর্মা ৩১

লালবাড়ির রহস্য ● কমল ৪২

রাজধানীর চিঠি ● অমৃত কুমার ৪৩

অন্তরালে ● বিশেষ প্রতিনিধি ২৭

মুক্তাঞ্চল (বেলঘরিয়া) ● বিশেষ প্রতিনিধি ৩২

উৎকোচ সংহিতা : তত্ত্বজ্ঞান ● নারায়ণ দাশশর্মা ২৮

পুস্তক পরিচয় ● ৪৬

বিনোদন ● ৪৪

সংবাদ সাহিত্য ● ৪৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ● আশিস মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদের ছবি ● শিখর কর্মকার

এই সংখ্যায়

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি নিয়ে ইদানিং বিভিন্ন পদ্ধতিতে টাকা জালিয়াতির নানারকম অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে ব্যাংক অব বরোদার বিভিন্ন রকম জালিয়াতি, চুরি ও ষড়যন্ত্রের নেপথ্য কাহিনী এই সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

আগামী সংখ্যায়

• বনফুল সম্পর্কে বিশেষ রচনা •

ছোট গল্প বড় লেখক

নারায়ন দাশশর্মা

বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্প্যু কম্পোজিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ১৬ রাজা রামমোহন সরণি কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩

দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন ৬১৭৬৭১

দাম: দু'টাকা

পূর্বাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৩৫ পয়সা

পূর্বাঞ্চল ও কলকাতা বাদে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৫০ পয়সা

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা

২৮ আষাঢ় ১৩৯২ □ ১৩ জুলাই ১৯৮৫

সম্পাদক
চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস
সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপক
অরুণাংশু ঘোষ

প্রধান কর্মসচিব
শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা
আশিস মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ
শহীদুল ইসলাম

চিঠিপত্র

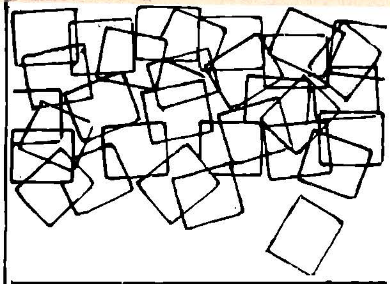

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

'শনিবারের চিঠি' ৮ জুন ৮৫ সংখ্যাখানি পড়লাম। শ্রীমতী মিনতি দত্তরায়ের "মোসায়েবের আত্মকথা" 'নিন্দুকের প্রতিবেদনখানি' পড়ে ভাল লাগল। আমার মত অনেক পাঠকের মনের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। লেখিকার কাছে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা থাকল।

তবুও ভাবছি সম্পূর্ণ প্রতিবেদনখানি পাবলিসিটি মাস্টার শংকর বাবুরই এক পুরান কায়দার পাবলিসিটি নয়তো? যাই হোক লেখিকাকে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন। পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ
চন্দন দত্ত
২০.৬.৮৫ ১৬৭/এ নিউক লোনা
প্রধান নগর
দার্জিলিং
734403

সম্পাদক,
শনিব[illegible] চিঠি,
কলিক[illegible]।

মাননীয় মহাশয়,

'শনিবারের চিঠি' প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি এর পাঠক। সম্পাদকীয় দপ্তরে এই প্রথম চিঠি লিখছি। আমার বয়স ২৫ বছর। সুতরাং আগেকার 'শনিবারের চিঠি'র' নাম কেবল নাম হিসেবেই জানা আছে, অন্য কিছু নয়। আমার চিঠি লেখার কারণ অন্য। একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের সংগে এই পত্রিকাটি নিয়ে আমার আলোচনা হচ্ছিল। তার অভিমত এ সম্বন্ধে না জানিয়ে পারছি না।

"রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করার জন্য গুচ্ছের পত্রিকা বাজারে রয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কৈ? 'দেশ' পত্রিকার পাশাপাশি দাঁড়ানোর মত কোন পত্রিকা নেই। অথচ 'শনিবারের চিঠি'র ওপর পাঠকরা বড্ড আশা নিয়ে বসে আছেন। কবিতার জন্য জায়গা কোথায়? একদা বহু প্রথিতযশা লেখকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ পেত, বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু নতুনদের লেখা কৈ? প্রতি সংখ্যায় পুরানো সংখ্যা থেকে একটি পুনঃপ্রকাশিত হোক।"

আমি নিজেও একমত এ ব্যাপারে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও বাহবা নয়। সমস্ত যুবক-যুবতীর সামনে এই পত্রিকা হয়ে উঠুক তাদের মনে[illegible]প্রকাশ করার উপযুক্ত জায়গা, ন[illegible] [illegible]জ্জিত এই পত্রিকার কাছে আ[illegible]ক আশা, অনেক দাবী।

নমস্কারান্তে
ইতি
২৬।৬।৮৫ দেবাশিস ঘোষ
পোঃ কৃষ্ণনগর,
নগেন্দ্রনগর, নদীয়া।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার প্রথম বর্ষ ছত্রিশ সংখ্যার চিঠিপত্র পড়ে জানতে পারলাম যে ১৮ই মে, ১৯৮৫ সংখ্যাটির জন্যে আমি যে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সে পরীক্ষায় কোনক্রমে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। এটা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের সংবাদ। ঐ সংখ্যার (১৮।৫।৮৫) পরীক্ষক কঠিন ও কঠোর হাতে পরীক্ষার্থীদের নম্বর দিয়েছেন।

বিদ্যুৎবাবু 'জিরো' পেয়েছেন। পরীক্ষক বিদ্যুৎবাবুকে আর পরীক্ষায় বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বিদ্যুৎবাবু কোন ছার, সরোজবাবুকে 'ওয়ার্নিং' দিয়ে তিনি ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গিয়েছেন শক্তি-সমরেশ, নবনীতা-মহাশ্বেতার কাছে। তাদের জ্ঞান দেখে তিনি বিস্মিত। এদের সাহিত্যে কোন জ্ঞান নেই। তাসের 'ব্রে' খেলার আসরে যেমন 'মাইনাস' শব্দটা থাকে সেইরকম কোন প্রথা যদি চালু থাকত তবে পরীক্ষক তাদেরকে সেই নম্বরই দিতেন।

সেক্ষেত্রে আমি এই ভয়ংকর বিদ্বান ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। সুমিতবাবু বোধহয় বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় পন্ডিত। সুকুমার সেন পরীক্ষায় বসলেও বোধহয় ঐ 'জিরো' ছাড়া 'হিরোর' আখ্যা পেতেন না।

এত কান্ড-কারখানা ঘটে যাওয়ার পর আমার মত একজন সাধারণ লোক যে তার কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে, এই যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন, 'যিশুর সমাজ' নিবন্ধটি 'ইনফরমেটিভ', মোটামুটি। নতুনত্ব কিছু তেমন নেই। ভাগ্য ভাল যে আমার মাথার উপর তার ছড়ি ওঠেনি। নবনীতা-মহাশ্বেতা শক্তি-সমরেশ আর বিদ্যুৎবাবু পরীক্ষায় ফেল করলেও, আমি পাস করে গেছি। ইতি

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬.৭.৮৫ পরীক্ষা দপ্তর
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৩২

সম্পাদক সমীপেষু

মান্যবরেষু,

'শনিবারের চিঠি'র একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে ২৯শে জুনের সংখ্যায় অজিত চক্রবর্তীর প্রতিবেদন 'পদ্মা খাস্তগীর বনাম স্নেহাংশুকান্ত' যে সত্য ও তথ্য প্রকাশ করেছে তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একমাত্র 'শনিবারের চিঠি' এ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার সৎ সাহস দেখিয়েছে, যা কোন রহস্যজনক কারণে অন্যান্য সংবাদপত্র পারেনি। হাইকোর্টে চাকরী সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার একটি মামলা কয়েক বছর ধরে ঝুলে আছে তাই নিয়মিত যাওয়া – আমার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে প্রণব চ্যাটার্জী মারফৎ হলফনামা দাখিল করার সময় প্রার্থনার ঘটনা আমার জানা ছিল। কিন্তু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি গোপন করে একটি বিশেষ ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে বিচারপতি খাস্তগীর একতরফাভাবেই হলফনামা দাখিলের আদেশ দেন। আপনারা এই তথ্যটি ফাঁস করে পারতপক্ষে এক সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফয়দা লোটার চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছেন।

মহাধর্মাধিকরণ বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসেছে এবং কিভাবে মহামান্যদের হরিহরছত্রে পর্যবসিত হয়েছে, বিহার সরকারের লবণ সংক্রান্ত মামলায় তা প্রকট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফাইল ও রায়ের নকল ছাড়াই যে প্রয়োজনে ওভারটাইম চলে, এ তথ্যও জনস্বার্থে প্রকাশ করা জরুরী ছিল। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বছরের পর বছর মামলার শুনানীর আশায় ঘুরতে থাকব আর আমাদের বোঝান হবে –– আইনের চোখে নাকি সবাই সমান। এমন চলতে থাকলে হয়তো একদিন হাইকোর্টের চত্বরে বঞ্চিত আশাহত মানুষরা সম্বিৎ হারিয়ে চিৎকার করতে থাকবে –– 'তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়'!

নমস্কারান্তে।

বিনীত,
অসিত চৌধুরী
৭/২, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট,
৭.৭.৮৫ কলিকাতা – ৪৭

রম্যরচনা

পথ পথেই হারায় মন হারায় মনে

বিনয়েন্দু চক্রবর্তী

পথ পথেই হারায় মন হারায় মনে। এ এক আচ্ছা ফ্যাচাং। যে যেখানে ফষ্টিনষ্টি করতে যাচ্ছে সে সেখানেই হারিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়াও তো হারাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি মিনি এসে বিনি নোটিশে মারলো ধাক্কা, বাস্ সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেয়ে হারিয়ে গেল। তাই কে নাকি তার বন্ধুকে বলেছিল – 'দ্যাখ্ রাস্তায় আজকাল অনেক লোক মারা যাচ্ছে, রাস্তাকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।' সে কথা শুনে বন্ধু জবাব দিয়েছিল – 'তাই নাকি? বিছানায় শুয়ে তো সবচেয়ে বেশি লোক মারা যায়। তা হলে তো বিছানাকেও এড়িয়ে যেতে হয়।' পথেই হোক আর মনেই হোক সামলে চলতে না জানলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকবে। এই পথ হারিয়েই সৎ লোক অসৎ হয়, চালাক বোকা বনে যায়, নেতা ডিগবাজি খায় আর রক্ষক ভক্ষক হয়ে তক্ষকের মত কাজ করে। পথ হারালে তাও রক্ষা। অনেক কসরৎ করে আবার সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার চান্স থাকে কিন্তু মন হারানো এক ভজকটের ব্যাপার। তখন নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে খাবি খেতে পারে। মনে ফাঁস লাগলে পাশ কাটিয়ে খাস জায়গায় আসার আশাও থাকে না। ফলে সত্যনাশ।

কপালকুণ্ডলায় নবকুমার পথ হারিয়েছিল। 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' শোনার পর থেকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করে সঠিক পথের সন্ধানও সে পেয়েছিল। কিন্তু পেলে কি হবে? এর মধ্যে সে মন হারিয়ে বসলো, মন হারিয়ে সে মৃন্ময়ী বা কপালকুন্ডলাকে পেল কিন্তু আবার বিশ্বাসের পথ হারিয়ে অবিশ্বাসের পথে চলতে গিয়ে সে সর্বনাশ ডেকে আনলো। শেষ পর্যন্ত পথ তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করালেও হারানো মন নিয়ে দু'জনেই চিরকালের মত হারিয়ে গেল।

পথ হারালে কি হয়? সঠিক পথকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। সেটা হলো কোন জায়গা থেকে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার সময়। এটা অনেক সময় গভীর জঙ্গলে হেঁটে যাওয়ার সময় ঘটতে পারে কিংবা অচেনা কোন শহরেও হতে পারে। কিন্তু জীবনের পথে চলতে গিয়ে বেমক্কা বিপথে চলে গেলে ফিরে আসা মুস্কিল। সংসারে জঙ্গল তো কম নেই, সেখানে দঙ্গল বেধে চলতে চলতে জীবনের সলতে আর কোথাও জ্বলতে চায় না। অভ্যেস বলে একটা কথা আছে তো! এই প্রসঙ্গে অভ্যেসের একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক ভদ্রলোকের বারোটি সন্তান। অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। কাজেই চিন্তা নেই। কিন্তু তিনি তাতেও ক্ষান্ত হলেন না। ত্রয়োদশ সন্তান জন্মাবার পর তার এক বন্ধু তাকে বলেন – 'আচ্ছা তোর কি কোন আক্কেল নেই? আবার ছেলে পয়দা করলি? তোর বৌএর শরীরের হাল একবারও ভাবলি না?' ভদ্রলোক কাচুমাচু হয়ে জবাব দেন – 'কি করবো বল? অভ্যেস। ছাড়তে পারছি

কৈ?' খুব সত্যি কথা। অভ্যেস বাড়তে দিলে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে তখন আর ছাড়তে পারে না। এই অভ্যেসের ঠ্যালা যেন ড্যালা দিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেয়। হেলায় বেলা চলে যায়। কিন্তু আমরা থামি না। বরঞ্চ যাওয়ার আগে বেশ কিছু চ্যালা তৈরি করে রেখে যাই যারা এ পথকেই খামচে ধরে আরও কিছু চামচে বানিয়ে ফেলে।

যত মত তত পথ। মতিচ্ছন্ন হলে পথও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়। এ সব পথের অলিগলি সকলে বুঝতে পারে না। আঁধার পথে চলতে গিয়ে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হয়ে ধাঁধার খপ্পড়ে পড়ে মাঝে-মাঝে হাঁদা বনে যেতে হয় কিন্তু সঠিক পথে ফিরে আসা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ চাওয়া আর পাওয়ার লোভ ক্ষোভের কারণ হলেও বাড়তে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে পারে না। সেই ঢেউ গোনার গল্পটা মনে পড়ে। এক ব্যক্তি কাজে খুব ঘুষ খেত। যেখানেই তাকে লাগানো যাক না কেন সে কায়দা করে ফয়দা তুলে নিত। বিরক্ত হয়ে রাজামশাই শেষ পর্যন্ত তাকে নদীর ধারে বসিয়ে দিলেন। ঢেউ গুণে রাখাই হলো তার কাজ। লোকটি চুপচাপ নদীর ধারে বসে ইচ্ছামত ঢেউ গোনে। অন্য পার হতে একটি নৌকো এসে এদিকের ঘাটে লাগতেই সে গিয়ে মাঝিকে পাকড়ায় – 'রাজার হুকুম ঢেউ গোনা। তুই বাধা দিয়েছিস ঢেউ ভেঙে দিয়ে। চল্ রাজার কাছে।' মাঝি তখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে শেষ পর্যন্ত কিছু গচ্চা দিয়ে রেহাই পায়। লোকটিও আবার সাচ্চা সেজে ঢেউ গুনতে বসে।

মন হারানোর ব্যাপার আমরা হামেশাই দেখতে পাই। এখানেও ঠিকমত সামলে না চললে যত ঝঞ্ঝাট এসে হামলে পড়ে। এক ছাতুওয়ালাকে দেখেছিলাম। ছাতু ছাড়াও সে ছোলা ভাজা চীনে বাদাম এ সব বিক্রি করতো। বেশ বিক্রি হতো দোকানটাতে। তবে লোকটা ছিল এক্কেবারে নীরস গদ্য। ঐ ছাতু, ছোলাভাজা আর পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনতো না। ভালই চলছিল। একদিন দেখি লোকটা যেন হঠাৎ পদ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। যে লোকটা একটি চীনে বাদামও বেশি দিত না তার কাছে পাঁচ-ছটি বেশি নিলেও কিছু বলছে না। মুখে গোঁফের ফাঁকে সব সময় হাসি আনার চেষ্টা করছে। একদিন দেখলাম একটি ছেলে এসে দোকানে ছোলা ভাজা চাইলো। ছাতুওয়ালা ছোলা ভাজা দিয়ে তাকে বলে – 'খোকাবাবু, ছাতু নাও, বাড়বে তাগদ যদি খাও।' আমি তখন ভাবছি কি ব্যাপার? যে লোকটিকে আগে কোনদিন হাসতে দেখি নি, মুখটা বাংলা পাঁচের মত করে রাখতো সেও হেসে হেসে ছন্দ মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে। একটু পরই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ও হরি! দোকানের ভেতরই একটি বয়স্কা মেয়ে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসছে। বুঝলাম ছাতুওয়ালার মন হারানোর ব্যাপার। এটার বাড়াবাড়ি হলে আর সারানো যাবে না। ওখানে আর দাঁড়ানো গেল না। ছেলেটি চলে যেতেই ছাতুওয়ালা পরে যা আরম্ভ করলো ওখান থেকে সরে আসা ছাড়া আর উপায় ছিল না। কিছুদিন পর দেখলাম যা ভেবেছিলাম

তাই। দোকানটি উঠে গেল। পরে শুনেছি মেয়েটি শুধু মন নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি সমস্ত ধন নিয়ে কোন্‌ক্ষণে সট্‌কে পড়েছে। বেমক্কা মন হারালে ধাক্কা খেতেই হয়। আর সব কিছু বুঝে তো মন হারায় না। এটা খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারও নয়। হঠাৎই মনটা পাগল হয়ে আগলছাড়া হয়ে পড়ে।

একজনকে দেখেছিলাম মন হারিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করতে। সে নাকি প্রায়ই কোন সুন্দরী মেয়ে দেখলেই মন হারিয়ে ফেলতো। এজন্যে এক জায়গায় বাড় হওয়াতে মারও খেয়েছিল। কিন্তু তাতে তার হার হয়নি। স্বভাব যার ওরকম তার পক্ষে থেমে যাওয়া মুস্কিল। যে কোন মেয়ে তার সঙ্গে হেসে কথা বললে সে ভাবতো মেয়েটি তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। একদিন শুনলাম সে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছে। গেলাম তাকে দেখতে। গিয়ে দেখি সে উদ্‌ভ্রান্তের মত বিছানায় বসে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। সম্মুখে তাকের ওপর একটি মেয়ের ফটো, পাশেই ধূপকাঠি জ্বালানো। ওর বন্ধুরা বললো যে মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে তাই এই বিপত্তি। সে নাকি শুধু একদিন এই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেছিল। বাস্‌, তারপর কোন প্রকারে তার এক ফটো যোগাড় করে ছেলেটি রোজ দেখতো। দেখতে দেখতেই তার মনে গেঁথে গেল যে মেয়েটিও তাকে ভালবাসে। লোকে কত সাধ্য সাধনা করেও মেয়েদের মন পায় না আর এ কিনা একটু কথা বলেই মাত করে দিয়ে কাত করতে চায়। গাড়ল কাকে বলে!

সত্যিকারের মন হারোনোতে বাড়াবাড়ি থাকে না। মহাপুরুষেরা মন হারান নিজের মনে। তখন তাঁদের কেন্দ্রীভূত অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয় বিভূতি। বাইরের মনকে হারিয়ে ভেতরের মনকে খুঁজে পান তাঁরা। সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বুঝে ওঁরা চুর হয়ে থাকেন আর আমরা দূর থেকে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। আমরা মহাপুরুষের বাণী শুনি কিন্তু সব সময় মানি না। আমাদের মন হারায় অন্য মনে। সংসারে অবশ্য এরও প্রয়োজন আছে। সত্যিকারের মন হারানো বা ভালবাসা শুধু নেশা নয়। এতে থাকে শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা। পাওয়ার আনন্দ বা না পাওয়ার বেদনা দুইই কোন শিল্প সাধনায় লুকানো শক্তিকে বের করে আনতে পারে।

পথ আর মন একসঙ্গে হারালে সর্বনাশ। এক ড্রাইভার গাড়ি চালানোর সময় আয়না দিয়ে পেছনের গাড়ি যে চালাচ্ছিল তাকে দেখতে পেল। সেটা চালাচ্ছিল এক মহিলা। মন হারিয়ে সে আয়নাতেই তাকিয়ে রইলো।

ওদিকে গাড়ি চলছে। অবশ্য বেশিক্ষণ চললো না। পথ হারিয়ে বিপথে, তারপর অ্যাকসিডেন্ট। আর একজন বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ দেখতে পেল উল্টো দিকের বাড়ির দোতলায় একটি রঙীন বসনের নড়াচড়া। বারান্দার সমুখে কাপড় টাঙানো থাকায় সবটা দেখতে পাচ্ছিল না শুধু নীচের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। বাস্‌ মন উড়লো কল্পনার পাখা মেলে। রঙীন বসন একবার ভেতরে গিয়ে আবার বাইরে এল। লোকটি হাঁ করে দেখছে। ওদিকে বাসও এসে গেছে। লোকটি বাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু দৃষ্টি সেই বারান্দায়। হঠাৎ হৈ হৈ আওয়াজ। লোকটি পথ হারিয়ে বাসের ধাক্কায় একদম রাস্তায়। কপাল ভাল। আঘাত সামান্যই। লোকটি পড়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখেছিল রঙীন বসনকে বারান্দায় টাঙানো কাপড়টি সরিয়ে নিতেই। মাথায় টাক, ইয়া মোটা এক ভদ্রলোক রঙীন শাড়ি লুঙ্গির মত পরে বারান্দায় কাজ করছিলেন। রঙীন শাড়িই লোকটির নাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ তো গেল সাময়িক রঙে ঢঙ করার ব্যাপার। সংসারে মনের মানুষকে মজিয়ে রাখতে নানা

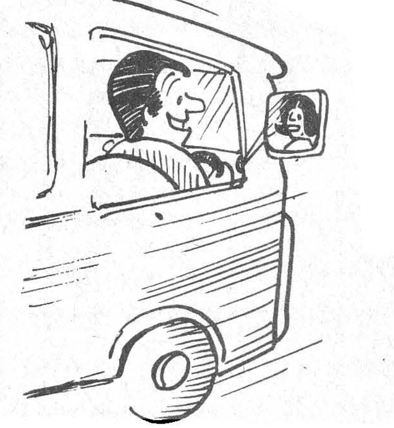

রকম ধান্দা গজিয়ে উঠতে পারে। এখন মাঝে মাঝে বাজে কাজে পায়ে চলার সড়ক হয়তো নরক হয়ে যায় অথবা জীবনের পথ নাকে খত দিয়েও সৎ রাখা যায় না। পথ হারালে বিপদ, মন হারালেও বিপত্তি। দুটোই এক সঙ্গে হারালে – একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর।

সারা পৃথিবীতে যে রকম ব্যাপারস্যাপার চলছে তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে পথ হারালেও ক্ষ্যাপার কিছু নেই। "সদা সত্য কথা বলিবে" ওটা হলো উপদেশ। সত্য কথা বলে বিপদে পড়লে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ নেই। কাজেই বুঝে শুনে গুণে গুণে কথা বলাই ভাল। কখনো সত্য কথা, কখনো অন্য কিছু বলে এড়িয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসা আবার কখনো 'অশত্থামা হত ইতি গজ'। আমাদের সংস্কৃতির সড়কে যে রকম বেধড়ক ভাবে মড়ক লেগেছে তাতে নরক সব সময়ই দেখছি। নূতন কিছু দেখার ভয় আর নেই। চলতে চলতেই পথ হারায় আবার বলতে গেলে পথই পথের সন্ধান জানিয়ে দেয়। পথ এগিয়ে যায়। হারানো ও খুঁজে পাওয়ার ভেতর দিয়ে কাল কেটে যায়। তারপর কাল একসময় মহাকালে মিশে যায়।

মনের রকমসকম একটু অন্য ধরনের। এটা যেন বকম্‌ বকমের মত। বাঁধনছাড়া অবাধ্য মন অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে হামলে পড়ে সামলে নিতে পারে না। জীবনের মায়াজাল বড় সাংঘাতিক। তবু এই মায়াজাল আছে বলেই সংসারটাও টিকে আছে। আশা থাকবে, ভালবাসা থাকবে, যতক্ষণ কায়া আছে কিছুটা মোহমায়াও থাকবে। যত কিছুই থাক না কেন, সংযত না করলে এদের উপজাত জিনিসগুলি বেড়ে গেলে জীবনটা সহজাত থাকে না। বাড়াবাড়ি হলে শেষে ছাড়াছাড়িও হতে পারে আবার সবকিছু নষ্ট হয়ে কষ্ট পেয়ে গড়াগড়িও দিতে হতে পারে। সুতরাং সাধু সাবধান! মনটা কিছুটা হারালেও আগামেই লাগাম টেনে ধরে রাখতে পারলে লাভ বই ক্ষতি হয় না।

পথ পথেই হারায়
কাল সে তো মহাকালে
মন মনেই হারায়
জীবনের মায়াজালে

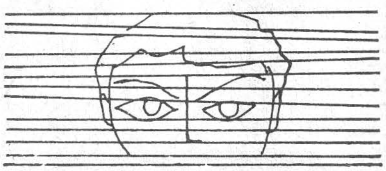

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

।। ২৫ জুন ১৯৭৬।।

আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা যুবতী মেয়ের ছবি ছাপতে পারলে ভারী খুশী হন। আজকের কাগজের প্রথম পাতায় দেখলাম নাফিসার ছবি। মুখে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। নাফিসা কে জানেন? তিনি ভারত সুন্দরী। বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতায় নামবার জন্য টোকিও যাচ্ছেন। আনন্দবাজার খবর দিচ্ছেন বয়স ১৯ বছর, বর্ণ উজ্জ্বল। উচ্চতা ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি–আর পড়তে পারলাম না। আমার বাড়ির সামনে ইলেকট্রিক থামে যে গোশালিক দম্পতী বাসা বানিয়েছে তারা ডেকে উঠল। তিনটি বাচ্চা হয়েছে তাদের। আহা এদের সার্থক জীবনের কথা কোনও কাগজে ছাপে না। ওরা জানেই না যে কাগজ বলে একটা জিনিস আছে। যেখানে ছবি ছাপা হলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ভালো কথা, গোশালিকের গান শুনেছেন? অপরূপ।

গো–শালিক পাল্লা দেয় দোয়েল শ্যামার সঙ্গে
অঙ্গ ভরে আছে
তার নানা রূপের লক্ষণও
প্রাইজ পাবার চেষ্টা কিন্তু
করে নি সে কক্‌খনো।

।। ২৬ জুন ১৯৭৬।।

লোভ এবং কাম এই রিপু দুটি
বড় বলবান
যুগে যুগে এরা ধর্মকে নীতিকে
করে খান খান
অনার্যরা আর্য হয়েছিল
আর্যরা প্রথমে বৌদ্ধ পরে মুসলমান
হয়েছিল কারণ তারা পড়েছিল
এদের পাল্লায়
ভজেছিল বুদ্ধে এবং পরে আল্লায়
লোভ এবং কামের পশরা সাজিয়ে
শক্তির দামামা বাজিয়ে
এল ফিরিঙ্গি ইংরাজ
আমরা খৃস্টান হলাম
আমরা আধুনিক হলাম
শিখলাম তাদের বুলি
পরলাম তাদের সাজ
আমাদের যা মতিগতি
ছুটে যাই দ্রুতগতি
দেখলে কিছু লোভনীয়
ভুলে যাই ঐতিহ্য
ত্যাগ করি আত্মীয়
তাই চলতে পারি না
ভবিষ্যতে হব কি না
মার্কিন বা চীনা।

।। ২৭ জুন ১৯৭৬।।

বন্ধুবর পরিমল গোস্বামী কাল সন্ধ্যায় সাড়ে ছটায় মারা গেছে। তার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা কত গাঢ় ছিল তা নিয়ে বাগ বিস্তার করতে চাই না। কারণ তা বর্ণনা করে বলা যাবে না। তবে একটা কথা বলব–সে মারা যাওয়াতে আমি সুখী হয়েছি। ইদানীং নানাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল সে।

কবিতা লিখি একটা।
পরিমল, মরে গিয়ে বেঁচে গেলে ভাই
বার্ধক্য সশরীরে বেঁচে সুখ নাই।
বিশেষত এদেশেতে বর্তমান কালে
সমস্তই কলুষিত জালে ও ভেজালে
ছিলে তুমি চিরকাল বিশুদ্ধ প্রেমিক
পবিত্রের পক্ষপাতী রসিক নির্ভীক
আঙুর বাসতে ভালো পাচ্ছিলে নিম
আদর্শের অপমানে কষ্ট অসীম।
মরে গিয়ে বেঁচে গেলে। যতদিন ছিলে
রঙে রসে সৌরভেতে পূর্ণ করে দিলে
বঙ্গবাণী মন্দিরকে। বেশ গেছ ভাই
এ বাজারে বেঁচে আর কোন সুখ নাই
তোমার স্মৃতিটি বক্ষে বহি দিনরাত
আশা করি ওপারেতে হবে মোলাকাত।

।। ২৮ জুন ১৯৭৬।।

আমাদের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইরানের শাহ এখন বিশ্বপরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি নিয়ে আলোচনা করছেন। ইতিপূর্বে ভুট্টোর সঙ্গেও এই ধরণের আলোচনা হয়েছিল। বিশ্বপরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি এ যুগে সেই প্লাটফর্মে যার উপর দাঁড়িয়ে যে কোন দেশের নেতারা দু-চার কথা বলেন এবং তা কাগজে ছাপা হয়।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ
গীতার কথা শুনিয়েছিলেন পার্থকে
তাতে তিনি এঁকেছিলেন
শান্তিকে না স্বার্থকে?
গীতার বাণী কোনও কাগজে ছাপা হয়নি।
তার পিছনে কোনও প্রোপাগান্ডা ছিল না, তবু
তা অমর হয়ে আছে।
আমাদের নেতাদের বাণীর
পরমায়ু এত স্বল্প–স্থায়ী কেন?
আজকে যাকে রাখা হল হিরণ্ময়
Casket-এ
কাল তার স্থান কেন
Waste Paper basket এ?

।। ২৯ জুন ১৯৭৬।।

রথে চড়ে এসেছে আষাঢ় ?
আজ রথ ?
মেঘের পর্বত চক্রবালে সারি সারি ?
অবিরাম অশ্রুবারি
বিরহের কান্নারই ?
সনাতন মেঘদূতী রূপ
চুপ চুপ চুপ
এ যুগেতে বিরহ হয় না
হয় টাকা গাড়ি বাড়ি মোটা গয়না
যে দূরত্বে উপজে বিরহ
সে দূরত্ব কোথা আজ কহ
কোন প্লেন রেডিওর দল
দূরত্ব ঘাতক সব। এ যুগেতে তাই
বিরহ চিরহ নাই
মিলনের তাড়নায় সকলেই
করে হাঁইফাঁই।
কারো মনে জাগে নাকো
দেশ কিম্বা মল্লারের গান
খিচুড়ি ওমলেট পেলে
আনন্দেতে হয় আটখানা।
শ্রোণীভারে অলস-গমনা
তন্বী শ্যামা প্রেয়সীরা পাইয়াছে লোপ
দামী দামী শাড়ি-পরা-ইয়ালাস্
পাউডার বদনা
প্রেয়সীরা আজকাল দেখায় ও দেখে বায়োস্কোপ।

।। ৩০ জুন ১৯৭৬।।

যে তিস্তা দুধ খেতে চায় না
ভাত খেতে চায় না
জামা কাপড় পরতে চায় না
সেই তিস্তাকে আজ পায়েস খেতে হবে
মাছের মুড়ো খেতে হবে
আরও কত কি খেতে হবে
নতুন জামা পরতে হবে
কারণ আজ তার জন্মদিন।
আজ সে তিন বছরে পড়ল।
জন্মদিনে তার বাবা তাকে
ছোট মোটর কিনে দিয়েছে একটা
আমি দিয়েছি বই আর চুড়ি
হাত ঘড়িও দেব একটা
কিনতে পাঠিয়েছি।
তিস্তার কিন্তু কোন বিষয়েই
মোহ নেই।
সবই সে হারিয়ে ফেলছে
ফেলে দিচ্ছে।
ভেঙে ফেলছে।
এই নির্মোহ দেবতা
কালক্রমে বিষয়ী সংসারী হবে
এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে
কিন্তু এইই নিয়ম।
কিছুদিন পরেই এ তিস্তার বদলে
যে তিস্তা মূর্তিমতী হবে
সে অন্য রকম।

।। ১ জুলাই ১৯৭৬।।

আজ ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের
জন্মদিন ও মৃত্যুদিন।
তাঁর ঋণ
আমরা শোধ করতে পারব কি ?
শোধ করতে চেষ্টা করব কি ?
মনে রাখব কি
বিধ্বস্ত বিক্ষত পশ্চিমবাংলাকে
নূতন করে গড়েছিলেন তিনি ?
না-আমরা রাখব না
আমরা রামমোহনকে মনে রাখি নি
এঁকেও রাখব না।
অদ্ভুত আত্মবিস্মৃত জাত আমরা
টাকা আর স্বার্থ ছাড়া
আর কিছুই চিনি না।
বুঝি না
টাকা আর স্বার্থকে আঁকড়াতে গিয়ে
আমরা ডুবছি
এগোচ্ছি না।
আমাদের ইতিহাসে
জ্যোতিষ্ক আছেন কয়েকজন
কিন্তু তাঁদের চারপাশে
কি গাঢ় অন্ধকার।

।। ২ জুলাই ১৯৭৬।।

আজ সকালে ডাক্তার বনবিহারীর কাছে গিয়েছিলাম রক্ত দিতে। আমার Blood Sugar আর Uric Acid কত আছে তা মাঝে মাঝে না জানলে তার অস্বস্তি হয়। তার মানে বনবিহারীর। বড় একজন Pathologist সে। লোক হিসাবে আরও বড়। তুলনা মেলা ভার। সাহিত্য রসিকও খুব। তাই আমার সংগে ঘনিষ্ঠতা। তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। Ulceratin Colitis-এ ভুগছে। Blood Pressureও বেড়ে যায় মাঝে মাঝে। চিন্তা হয় ওর জন্য।

জীবনের প্রিয়জন যারা
একদিন ছেড়ে যাবে তারা
ছেড়ে গেছে বহুজন, ভুলেছি তাদের
এঁদেরও ভুলিয়া যাব ফের।
আমিও ডুবিয়া যাব বিস্মৃতির অতলে
বিস্মৃতিই সার সত্য বুদ্ধিতে বলে।
বুদ্ধির উপর এক মহাবুদ্ধি আছে
অন্য কথা শুনি তার কাছে
সে কেবল কয়
মৃত্যুই শেষ নয়।

।। ৩ জুলাই ১৯৭৬।।

মন্ত্রী স্বর্ণ সিংহ (উচ্চারণ সওরন্ সিং) আজ আবার আটদফা উপদেশ দিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রীও বারবার দিচ্ছেন। বুদ্ধদেবের আমল থেকে এই উপদেশ চলছে-দেশ কিন্তু যেমন ছিল তেমনি আছে। উপদেশ দিলে কেউ শোনে না। কেন ? কারণ দেশের লোকের চরিত্র গঠিত হয় নি। ঢালু জায়গায় জল দাঁড়ায় না। দেশের চরিত্র গঠন করবার সুব্যবস্থা নেই, সদুপদেশ পালন না করলে কারো শাস্তি হয় না। বরং অনেক সময় মিথ্যাবাদী ও চোর সম্মানিত বা পুরস্কৃত হয়।

মাঝে মাঝে সাজিয়ে আনছি
উপদেশের ডালা
ভুলে যাচ্ছি এসব হচ্ছে
ভস্মে ঘি ঢালা।

অত্যন্ত বদমাইসি করছে আজ তিস্তা
বর্ণনা করতে গেলে ফুরিয়ে যাবে
কাগজ দিস্তা দিস্তা।

দিনটা মেঘলা মেঘলা। কাগজ বলছে শীঘ্রই ব্যাপক বৃষ্টি আরম্ভ হবে।

।। ৪ জুলাই ১৯৭৬।।

কোনও পুরুষ যখন সভার শিরোমণি হন তখন তাঁকে আমরা সভাপতি বলি, নারী হলে কিন্তু সভাপত্নী বলি না, নেত্রী বলি। ঠিকই করি—'সভাপতি'টাও বদলে সভানেতা করাই উচিত। পতি-পত্নীর ব্যাপারটা পরিবারে নিবন্ধ থাকাই ভালো। সেটাকে সভায় টেনে আনা কেন? নায়ক-নায়িকাও চলবে না, ওতে রোমান্সের গন্ধ আছে। সভায় সে গন্ধ ছড়ানো সুরুচির পরিচয় নয়। 'নেতা' এবং 'নেত্রী'তে গন্ধ আছে রাজনীতির। সব সভা রাজনৈতিক সভা নয়। আচ্ছা সভা-মৌলি বললে কেমন হয়? স্ত্রী পুরুষ দুজনেই সভা-মৌলি হতে পারেন, অশুদ্ধ বা বেমানান হবে না।

কিন্তু আমি করছি কি? এদেশে যা চিরাচরিত তাই থাকবে। কিছু বদলাবে না। বৃথা খানিকটা সময় নষ্ট করে ক্ষুব্ধ হলাম। আরও ক্ষুব্ধ হয়েছি আষাঢ়ের ব্যবহারে। আজ ২০শে আষাঢ়—বর্ষার তো দেখা নেই।

এ দেশে মানুষই নয়
প্রকৃতিও ফাঁকিবাজ
করে না নিজের কাজ।

।। ৫ জুলাই ১৯৭৬।।

আজ কাগজের খবর। বড় বড় অক্ষরে প্রথমেই হানাহানির খবর। মানে সভ্যতা ও প্রগতির খবর।

(১) অতর্কিত ইজ্রায়েলী হানায় বিমানবন্দীরা মুক্ত'। গেরিলারা খতম।

(২) একশত উগান্ডা সেনা, চার ইজরেয়ালী নিহত। এগারোটি মিগ্ ধ্বংস ভারত এবং পূর্ব জারমানি যুক্ত ইস্তাহারে জানিয়েছেন
(৩)সংঘাতে বিক্ষুব্ধ এলাকায় সমঝোতার মনোভাব চাই
(৪) প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—সবার বন্ধুত্বই ভারতের কাম্য।

সবার বন্ধুত্ব কামনা করলেই
শত্রু কিছু হবেই
উঠবে ঝড় আন্ধি
সব দেশে জন্মায় নি
বুদ্ধ বা গান্ধি।

(৫) রসায়ন-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে।
কোন শিল্পে এগিয়ে আছে?
চুরি এবং কুঁড়েমিকে শিল্প বল যদি
পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে তাতে আছে নিরবধি।

।। ৬ জুলাই ১৯৭৬।।

আজও আনন্দবাজারে বড় বড় হরফে চুরির খবর ছাপা হয়েছে। "১৯ লক্ষ টাকা প্রতারণার দায়ে ব্যাঙ্ক অফিসার ও ছ'জনের বিরুদ্ধে সমন।"

পাঠরত বনফুল

চুরির কথা শুনতে শুনতে
কানে ধরল তালা
ইচ্ছে করে প্রত্যেককে
বলি ওরে শালা–।
ন্যায়রত্ন ছিল বাবা
জুলফি রেখে ছেলে
মদ্যসহ হোটেলেতে
গোমাংস খেলে
চুরি করে ডিগ্রি পেল
নেই কোনও শিক্ষা
সেলাম করে দ্বারে দ্বারে
নোকরি করে ভিক্ষা
দৈবাৎ পায় যদি
ফাঁকি দেয় কার্যে
অবশেষে ধরা পড়ে
প্রতারণা চার্জে
শতকরা নব্বই জনের
এই তো ইতিবৃত্ত
'হায় হায়' ছন্দে ভাই
চিত্ত করে নৃত্য।
যন্ত্রণায় দেশমাতার বুকে ধরে ফিক
এরা সব যুব না কি খাঁটি আধুনিক।

।। ৭ জুলাই ১৯৭৬।।

কলকাতায় বসে এক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কোন বাঙালী সাহিত্যিক বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এবং আরও যুগন্ধর সাহিত্যিক যা সৃষ্টি করেছেন তা কলকাতার বাইরে বসে করেছেন। মাইকেল করতে পেরেছিলেন, কারণ সে যুগে সভা সমিতির ভীড় ছিল না, আর তিনি খৃস্টান ছিলেন বলে সাধারণ লোক তাঁকে এড়িয়ে চলত।

কলকাতা ভারতবর্ষের হাট। এখানে ব্যবসা করা যায়, সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে যে নির্জনতা প্রয়োজন তা কলকাতা শহরে পাওয়া যায় না। দুটি সময় কলকাতা নির্জন। বেলা ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত, আর রাত ১টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত। এ সময় সাহিত্য–চর্চা করতে হলে যে মনোবল দরকার তা কটা সাহিত্যিকের আছে? তাই কলকাতাবাসী লেখকরা সাংবাদিক হতে পেরেছেন, চুটকি লেখা লিখেছেন, বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি।

।। ৮ জুলাই ১৯৭৬।।

প্রত্যেক জিনিসের যেমন একটা স্বাভাবিক রূপ আছে, সাহিত্যের, বিশেষত রসসাহিত্যের, নানা সৃষ্টির তেমনি বিশিষ্ট রূপ আছে। ছোট গল্প, বড় গল্প, উপন্যাস তিনটি আলাদা জাতের জিনিস। আমরা সাধারণত উপন্যাস বলে যা পড়ি তা টেনে–হিঁচড়ে–লম্বা–করা ছোট গল্প বা বড় গল্প। উঁইটিপিকে হিমালয় করা যায় না। করার চেষ্টা করা হাস্যকর। বর্তমানে সাহিত্যে আমরা এই হাস্যকর কান্ডই করছি।

প্রবন্ধ লেখকের নিজস্ব চিন্তার অনন্যতা থাকা চাই। তা কিন্তু প্রায় থাকে না, থাকে অন্যের চিন্তার চর্বিত–চর্বণ, আর রাশি রাশি কোটেশন। আজকাল কবিতা পড়ে মনে হয় কবি আমাকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছেন, কবিতাটা দুর্বোধ্য বা ভঙ্গী–সর্বস্ব করে। মনে সুর জাগে না। সাময়িক সাহিত্য তাই আজকাল পড়ি না।

আধুনিক চোং–মার্কা
Stainless steel-এর গেলাস
কাৎ হয়ে যায় বারবার
সেকেলে খাগড়াই কাঁসার ভারি গেলাস
পছন্দ আমার।

।। ৯ জুলাই ১৯৭৬।।

ইংরেজ আমাদের অর্থ-শোষণ করে স্বদেশে নিয়ে গেছে, কিন্তু সব চেয়ে বড় ক্ষতি করেছে তারা আমাদের চরিত্র নষ্ট করে। সে যুগের 'ইয়ং বেংগল'রা যা অমৃত বলে পান করেছিল এখন দেখা যাচ্ছে বিষ। আমরা আমাদের ঐতিহ্য হারিয়ে একদল চাকর হয়ে গেছি। চাকরি ছাড়া কিছু করতে পারি না। আগে যে জাত ব্যবসা করত, ছবি আঁকত, শিল্পী ছিল সে আজ কেরানী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। 'ইয়ং বেংগল'রা যে আদর্শ দেশের সামনে তুলে ধরেছিল তার মধ্যে মদ আর ব্যভিচার –– এই দুটোই টিঁকে গেছে আধুনিকতার অভিজ্ঞান স্বরূপ। ইংরেজ রাজত্বে বাঙালী যে বিষপান করেছে তাতে তার বৈশিষ্ট্য সে হারিয়ে ফেলেছে। সে এখন পান্ডিত্যকামী নয় ডিগ্রী লোলুপ। ইয়ং বেংগলদের মতো বিদ্যা সে অর্জন করতে পারে না, শুধু মদ্যপ আর লম্পট হয়েছে। চরিত্রহীন, চোং-প্যান্ট পরা জুলফিদার চালিয়াত্ মাতালরাই ইংরেজ রাজত্বের শেষ ফল এবং বিষ-ফল। আগে ২/৪ জন প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেখা যেত। এখন সব শূদ্র আর চন্ডাল।

।। ১০ জুলাই ১৯৭৬।।

আষাঢ় আসরে নেবে গেছে। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। আজ কাগজে দেখছি বিহারে মস্ত বড় একটা লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে মনোহরগড় জেলার চিরিয়ায়। এটি নাকি ভারতের অন্যতম বৃহৎ লোহার খনি হবে। জামশেদপুরও বিহারে। বিহারীদের চরিত্রের মধ্যেও একটা লৌহ-দৃঢ়তা আছে। ওদের মতো কায়িক পরিশ্রমী ভারতে খুব বেশী নেই। বেশ তাগড়া বলিষ্ঠ লোক ওরা।

আধুনিক সভ্যতায়
লোহা খুব দরকারী
ওরই জোরে সভ্যতাটা
আছে নাকি টিঁকে
কিন্তু হায় সকলের
(সরকারি বে-সরকারি)
লোভ কিন্তু সোনা রূপো
হীরে মোতির দিকে
লোহা আছে পেরেকেতে
আছে লোহার পুলে
হীরে মোতি সোনা রূপো
বেড়ায় দুলে দুলে
হয়ে অলঙ্কার
লোহার চেয়ে বেশী চমৎকার
দরকারীর দিকে মোদের লোভ নেই কি তত
সুন্দরের দিকে সেটা সতত উদ্যত।

ব্যাংক অব বরোদা
না
ব্যাংক অব বৃন্দাবন

চুরি, ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি আর পাপাচারের লীলাভূমি

প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি যে ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে টাকা জালিয়াতির খবর আমরা পাচ্ছি তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভারতের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির যে সুনাম ছিল জাতীয়করণের পর তা নিঃসন্দেহে বিলীন হয়েছে।

এমন নজিরও আছে যেখানে এক সরকার এসে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছেন, আবার পরে অপর সরকার জাতীয়করণ তুলে নিয়েছেন। উদাহরণ মিশর ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ। ফলে সেখানে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুখে আবার হাসি ফুটেছে। আমাদের দেশেও কী সেটাই হতে চলেছে?

এই ধারণাটি দৃঢ়তর হয়েছে ব্যাংক অব বরোদার সাম্প্রতিক কাজকর্মে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, যথেষ্ট সুনাম ছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তো বটেই, সারা দেশে ১৮৭০টি শাখা, বিদেশেও সবচেয়ে বেশি শাখা এই ব্যাংকের, মোট ৬০টি। পশ্চিমবঙ্গের ৬৭টি শাখা কিন্তু চলছে ঘাটতির মধ্যে দিয়ে। ভাবতে পারেন ব্যাঙ্কের এই রাজ্যে কর্মরত প্রায় সতেরশো কর্মচারীর মাইনেপত্র, এমনকি গ্রাহকদের ক্লিয়ারিং-এর টাকার যোগান দিতে হচ্ছে ব্যাঙ্কের হেড-অফিস বোম্বেকে? না, এটা কিন্তু কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য ঘটেনি। শ্রমিক অশান্তির জন্যেও ব্যাঙ্কে লক-আউট হয়নি। ঘটেছে কলকাতার দুই বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠির চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রে। ব্যাপারটা নিয়ে এখন চলছে সি. বি. আই-এর তদন্ত।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং গত বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় বলেছেন, আর. কে. জৈন, এম. কে. পোদ্দার ও জে. পি. পোদ্দার যেভাবে ব্যাংক অফ বরোদার কয়েকজন শাখা ম্যানেজার রিজিওনাল ম্যানেজার ও অফিসারদের যোগসাজসে কলকাতায় ব্যাংক অফ বরোদার বিভিন্ন শাখায় জালিয়াতি করে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন সে বিষয়ে সরকার অবহিত আছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও সে বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের জন্যে সি. বি. আই-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সংসদ সদস্যের চাপে পড়ে অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনার্দন পূজারীও একটি বিবৃতি দেন রাজ্যসভাতে। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, সি. বি. আই-এর কলকাতা শাখা গত ১৪ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি পৃথক পৃথকভাবে ব্যাঙ্ক অব বরোদার চারজন অফিসার বি. এ. সিপি, ডি.কে. পট্টনায়েক, এ.কে. বসু ও এন. আর. বর্ধনের বাড়িতে অনুসন্ধান চালিয়ে জালিয়াতির প্রচুর কাগজপত্র আটক করেছেন। এছাড়া আরো চল্লিশটি জায়গায় অনুসন্ধান চালানো হয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এত বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ কলকাতা তো বটেই, পূর্ব-ভারতেও বোধ হয় রেকর্ড। এই ব্যাঙ্কের তিনজন শাখা ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর সংগে জড়িতদের গতিবিধির উপর সি. বি. আই. সর্তক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। সি. বি. আই. জানায়, কয়েকটি ভূয়া ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসপত্তর সংক্রান্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার নামে ব্যাংক অফ বরোদার এই শাখাসমূহে লেটার অফ ক্রেডিট খোলা হয়। নাম, ধাম, উদ্দেশ্য পৃথক হলেও ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই প্রায় এক। অর্থাৎ যিনি ক্রেতা, তিনিই আবার বিক্রেতা। যে সব সংস্থার নামে টাকা তোলা হয়েছে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। দু-একটির অস্তিত্ব থাকলেও তা 'সন্দেহজনক ও আপত্তিকর'। আরো অভিযোগ, এই চক্র একটি নামকরা বড় কোম্পানির শেয়ার কেনার চেষ্টায় ছিল। ঠিক সেই সময়েই সি. বি. আই. হানা দেয়।

এই ঘটনাটা হয়ত আমরা জানতেও পারতাম না, পারলাম শুধুমাত্র প্রথম যে

শাখাটি থেকে এই জালিয়াতির শুরু, সেই ব্যাংক অব বরোদার ল্যান্সডাউন শাখার একজন হেড-পিয়নের জন্যে। তিনি জানালেন, সাধারণভাবে যেখানে পাঁচটার সময় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবার কথা সেখানে রাত ৯টা/১০টা পর্যন্ত ব্যাংকের দরজা খোলা থাকে। মাঝে মাঝে নেশাগ্রস্ত মানুষের হৈ-হুল্লোড়, সন্ধ্যারাতে ব্যাংক অফ বরোদার বিশেষ বিশেষ মহিলা কর্মীদের আনাগোনা, সংগে মাঝে মাঝে ভিডিও, ব্লু-ফিল্মের নোংরামি। এসব বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না তুলসিদাসী রামায়ণী পড়া হেড-পিয়নটির। তাই সত্যি কথাটি সে বলে দেয় ইউনিয়নের কাছে। এরপরেই চেষ্টা হয় ঢাকা দেবার। ধরা পড়ে ১ কোটি টাকা তছরূপের ব্যাপার। এটা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের প্রথমে। যদিও ১৯৮০-৮১ সাল থেকেই এই জালিয়াতির ঘটনা ঘটছিল। এখন সেটা বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আঠারো কোটি টাকার উপরে। আরও কিছু সরকার এখন জানাচ্ছেন না যেহেতু সি. বি. আই এখনো অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এই অনুসন্ধান চালাবার জন্যে সি. বি. আই. অফিসারদের একাধিকবার বোম্বাই, দিল্লিসহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে।

ব্যাংক অফ বৃন্দাবন

সত্যি কথা বলতে কি, কিছু দারোয়ান, কিছু হেড পিয়ন, কিছু সাব-স্টাফ ও কিছু সং কর্মীর কাছে ব্যাংক অব বরোদা এখন আর ব্যাংক নয়, তাদের কাছে ব্যাংক হয়েছে "ব্যাংক অব বৃন্দাবন"।

বৃন্দাবনের এই লীলা-খেলা প্রথম ধরা পড়ে ব্যাংকের একমাত্র মহিলা শাখা যোধপুর পার্ক শাখায়। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে প্রথম যখন এই শাখাটি উদ্বোধন হয় তখন কিন্তু শাখাটি চলতো সব মহিলা কর্মী দিয়েই। এখন যদিও সেখানে মহিলা ও পুরুষ কর্মীর সংখ্যা সমান সমান। বছরটিকে আন্তর্জাতিক মহিলা বছর বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর সেই উপলক্ষেই ওই শাখাটির প্রতিষ্ঠা লাভ। ১৯৭৮-৭৯ সালের পর থেকে ওই শাখায় পুরুষ কর্মীদের যাবার প্রবণতা দেখা যায়। মহিলা কর্মীরা সেখানে যেতে রাজি হন না। তখন থেকেই ব্যাংকের নাম হয় "ব্যাংক অফ বৃন্দাবন"। এ ব্যাপারে ব্যাংক অফ বরোদা এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন ও ব্যাংক অফ বরোদা এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা ইতিবাচক উত্তর দেন। এখানেই শেষ নয়। ব্যাংকেরই কিছু কর্মীর অভিযোগ, ওই শাখায় গ্রাহক, মহিলা কর্মী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে পর্ণোগ্রাফীর বই আদান প্রদান শুরু হয়। কিছু দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা কর্মীও এর সংগে যুক্ত ছিলেন। ফলে নীট ফল দাঁড়ায় কাজে ঢিলেমি, মধুচক্রের আসর ও মাস গেলে ঠিক মাইনেটি পাওয়া। এই যখন যোধপুর পার্ক মহিলা শাখায় চলছে ঠিক অপরদিকে তখনই ল্যান্সডাউন, নিউ আলিপুর, হাজরা রোড ও রিজিওনাল অফিসে চলেছে জালিয়াতির চক্রান্ত। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় তার জন্যে চলেছে ফোনে বদলী। কলকাতা থেকে অফিসার বদলী হয়েছেন বোম্বেতে আর বোম্বে থেকে অফিসার এসেছেন কলকাতায়।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয় আরো অনেক পরে। সেটা আর এক জালিয়াতির ব্যাপার। বৃহৎ পুঁজিপতিদের এই চক্রের চক্রান্তে ব্যাংক তার রিজিওনাল অফিস ক্যামাক স্ট্রীট থেকে সরিয়ে শরৎ বসু রোডের নতুন বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। বাড়িটা আপনারা সবাই চেনেন, নাম, "বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট" বাড়িটার মালিক কিন্তু সেই সাহু জৈন ও পোদ্দার গ্রুপের লোকেরই অর্থাৎ জালিয়াতির নায়করাই। ওই বাড়িতে অফিস যাবার আঠারো মাস আগে থেকেই ১ লাখ ৩২ হাজার করে টাকা ব্যাংক ভাড়া বাবদ দিয়ে যায় ওদের। ১৯৮৩ সালে বাড়িটা তৈরি হতে আরম্ভ করে আর ব্যাংক ১৯৮৪ সালের ২৬ নভেম্বর ওই বাড়িতে উঠে আসে। প্রথমদিকে এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন সোচ্চার হয়েছিলেন বটে কিন্তু পরবর্তীক্ষেত্রে তাঁরাও চুপ করে যান।

ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকেনি। এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডি. পি. চাড্ডা দাবি জানালেন, সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে ব্যাপারটির তদন্ত করা হোক।

চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি ব্যাংক অব বরোদার এদেশের সব কটা শাখায় এক নির্দেশে ব্যাংকের হেড অফিস জানায় "ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন আমাদের অফিসারদের ব্যাংকের কোন গ্রাহকের গেস্ট হাউসে থাকা অথবা পানীয় অথবা সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাকে উৎসাহ না দিই। রিজার্ভ ব্যাংক আরো বলেছেন, ব্যাংকের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ নিজেদের এমন অবস্থায় নিয়ে না যান যাতে মনে হতে পারে ব্যাংকের কিছু গ্রাহক এই ব্যাংকের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মীর সংগে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।"

কিন্তু ব্যাংক অব বরোদার রিজিওনাল অফিসের সার্কুলার (No. Co: RR: 77/65, dated 6th April 1985) ও ব্যাংক অব বরোদার এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন লিফলেটগুলি অন্য কথা বলে। সম্প্রতি ব্যাংক অব বরোদার ১০ জন কর্মীকে সাসপেন্ড ও ১৫০ জনকে শো-কজ করা হয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া ১০ জন কর্মীর মধ্যে ২ জন মহিলা কর্মীও আছেন। ব্যাংক অব বরোদায় তিনটি ইউনিয়ন আছে, কর্মচারী সমিতি (আই. এন. টি. ইউ. সি), এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন (সি. পি. এমের) ও এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি. পি. আই.)। ব্যাংকে যে ধর্মঘট, মিটিং, মিছিল ইত্যাদি হচ্ছে তার সবই করছেন এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন। এরসংগে অপর দুটি ইউনিয়নের কোন সম্পর্ক নেই বলে ইউনিয়ন দুটির নেতারা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা একসংগে আলোচনায় বসতে রাজি আছেন। একবার আলোচনা করেছেনও। এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ সেনগুপ্ত বলেন, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকে চরম অশান্তি ডেকে আনতে চাইছেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য সি. বি. আই. তদন্ত বানচাল করা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করতে সম্পূর্ণ বিনা কারণে বা অত্যন্ত মামুলি কারণে কর্মচারীদের সাসপেন্ড করে চলেছেন। কাজের সময়ে ব্যাংকের ৫০ গজের মধ্যে মিছিল, জমায়েত নিষিদ্ধ করে কোর্টের হুকুম এনেছেন কর্মীদের চাপের মধ্যে রাখার জন্যে। এমনকি সাসপেন্ড করার অজুহাত আদায়ের জন্যে অত্যন্ত দায়িত্বশীল আমলারা প্ররোচনা দিচ্ছেন। সাসপেন্ড হওয়া ১০ জন কর্মীর মধ্যে ১ জন (কর্মচারী সমিতি) ছাড়া বাকি সবাই এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। অপরদিকে কর্মচারী সমিতি ও এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সাসপেন্ড ও জালিয়াতি এই দুটো ঘটনাই সম্পূর্ণ আলাদা। একে একত্রে দেখা উচিত নয়।

এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনের চাপে পড়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গত ২১ মার্চ থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের ক্লিয়ারিং বিভাগে সামিল হচ্ছেন না। ব্যাংকের গচ্ছিত টাকা থেকে ৫৩ কোটি টাকার মতন গ্রাহকদের চেক ভাঙাতে ব্যয় করতে হয়েছে। কোটি কোটি টাকার লোকসান স্বীকার করে ব্যাংক প্রতিদিন হারাচ্ছে কয়েকশো করে গ্রাহককে। বিগত দু'মাসে দুদিন ধর্মঘট পালন করেছেন এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন। এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করে কর্মচারীদের একাংশ ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার, অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের কাজ না করতে কোথাও ভয়

দেখিয়েছেন, কোথাও কাজ বন্ধ করিয়েছেন। ৬ জন অফিসারকে মারধোর করা হয়েছে। ২৪ মে'র ধর্মঘটের দিনে। এ সমস্ত খবরই দিয়েছেন ব্যাংকের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এ. এস. কৃষ্ণাণ ২৭ মে এক সাংবাদিক বৈঠকে।

কৃষ্ণাণ ওই বৈঠকে এও বলেছেন যে, আমরা কয়েকজন কর্মচারীকে ফিরিয়ে নিতে পারি যদি তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। এও উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়নের নেতারাও কর্মচারীদের গাফিলতির কথা স্বীকার করেছেন। ফলে কর্তৃপক্ষ বনাম ইউনিয়নের লড়াই এখন তুংগে। আর এই লড়াইয়ে বলি হচ্ছেন সাধারণ গ্রাহকরা।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পেনশনভোগীরা তাঁদের টাকা পাচ্ছেন না। বেকার যুবকদের সহায়তা করতে এই ব্যাংক বিগত কয়েক বছর ধরে তো এগিয়ে আসেনইনি বরং তাঁদের এমন বলে দেওয়া হচ্ছে কোন সহায়তা করা হবে না। এল. আই. সি. প্রিমিয়াম জমা দেবার গ্রাহকেরা তাঁদের প্রিমিয়াম জমা দিচ্ছেন অন্য ব্যাংকগুলিতে। গত ২১ মার্চ একদিনেই ব্যাংক অব বরোদার পাতিপুকুর শাখার ২০০টি চেক জমা পড়েছে ওখানকারই ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখায়।

ব্যাংক চলছে হেড অফিসের টাকায়

অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যাংকের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। কিন্তু পশ্চিমবংগ তথা পূর্বাঞ্চলের চিত্র আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি পাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। ১৯৭০ সালের ৫,৭০০ কোটি টাকার মূলধন বেড়ে আজ হয়েছে ৭০,০০০ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক মূলধন ৫,৬১২ কোটি টাকা। ব্যাংকের পশ্চিমবংগের শাখাগুলোকে চালাতে হচ্ছে হেড অফিস থেকে টাকা এনে। সারা ভারতের গ্রাহকের সংখ্যা বাড়লেও পশ্চিমবংগে তা কমের দিকে। বর্তমানে সারা ভারতে এই ব্যাংকের গ্রাহকের সংখ্যা ৮৪ লাখ ৭২ হাজার। এই তথ্য অর্থমন্ত্রকের যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তেমনি আলোচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ডাকা ব্যাংক অফিসারদের মিটিংঙেও।

পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক, নিউ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও আরো কয়েকটি ব্যাংকের জালিয়াতির বিষয়গুলি, আলোচিত হয়েছে, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তের নীট ফল নিয়েও। আভাস পাওয়া গেছে যে, অর্থমন্ত্রক আরো কিছুদিন দেখতে চান ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ। ইতিমধ্যে যদি ব্যাংকের ম্যানেজার ও অফিসাররা অগ্রগতি না দেখাতে পারেন তাহলে অর্থমন্ত্রক ব্যাংকগুলিকে আবার বেসরকারি সেক্টরে ফেরত দেওয়া যায় কিনা, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারেন। অর্থমন্ত্রী ব্যাংক অফিসিয়ালদের আরো কিছুদিন সুযোগ দিতে চান, প্রয়োজনে কিছুদিন অন্তর তাঁদের সংগে আলোচনা করে ব্যাংকের কাজকর্মের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হবে। এরপরেও যদি দেখা যায় ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ গতানুগতিক ও তাঁরা রাজীব মন্ত্রিসভার উন্নয়নমূলক বিশেষত কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র-শিল্প, গ্রামের সাধারণ মানুষ তথা শিক্ষিত বেকারদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করছেন তবে অর্থমন্ত্রককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

এখন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে দুটো পথ আছে, তা হলো, জাতীয়করণ বজায় রেখে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে অবাধ কাজ করার সুযোগ কিংবা তা হারিয়ে টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কাদের মতন বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়া। তাদের বেছে নিতে হবে এই দুটোর যে কোন একটাকে।

যাঁরা সাসপেন্ড হয়েছেন

তারিখ	নাম	শাখা
১৯.৩.৮৫	সুশান্ত সাহা	ক্যামাক ষ্ট্রীট
১৯.৩.৮৫	অশোক চক্রবর্তী	ক্যামাক ষ্ট্রীট
১৯.৩.৮৫	বলরাম বোস	ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ
২২.৩.৮৫	সুভাষ দে	দমদম
২২.৩.৮৫	অমল মিত্র	আন্দুল
২২.৩.৮৫	মিত্রা মিত্র	যোধপুর পার্ক
২২.৩.৮৫	তপন ব্যানার্জী	আসানসোল
২২.৩.৮৫	তৃপ্তি ঘোষ	দমদম
মে '৮৫	অজয়কুমার দাস	কৃষ্ণনগর

এঁরা সকলেই ব্যাংক অফ বরোদা এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। আর সাসপেন্ড হয়েছেন –

২২.৩.৮৫ মানবেন্দ্র হালদার আই. বি. বি. শাখার

ইনি কর্মচারী সমিতির সদস্য।

কি ভাবে এবং কি কারণের জন্যে এই সাসপেন্ড করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, পূর্ব ভারতে ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসের কর্মচারীরা প্রায় তিন মাস ধরে কয়েকটি ভাঙা চেয়ার মেরামতের দাবি করে আসছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তাঁর ইউনিয়নের সম্পাদক গত ১৪ মার্চ ওই অফিসের ম্যানেজারের কাছে প্রতিবাদ জানান। বলা হয় ওই প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। এইরকম একটা অবস্থায় নাকি পূর্বাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সহকারী জেনারেল ম্যানেজার দুজন রিজিওনাল ম্যানেজারকে সংগে করে নিয়ে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন ও অশালীন ভাষায় ইউনিয়নের সম্পাদককে তিরস্কার করতে থাকেন। সম্পাদক এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। কিছু কথা কাটাকাটি হয়। সহকারী জেনারেল ম্যানেজার সম্পাদকের প্রতি কুরুচিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করায় তার প্রতিবাদ জানান একজন সাধারণ কর্মী। সংশ্লিষ্ট কর্মীকে সাসপেন্ড করেন কর্তৃপক্ষ।

ব্যাঙ্কের আন্দুল রোড শাখায় মজুত টাকায় টান পড়ায় অন্য একটি শাখা থেকে পাঁচ লাখ টাকা আনা হয়। শাখার ম্যানেজার ওই টাকা না গুণেই নিয়ে নেবার জন্যে হেড ক্যাসিয়ারকে নির্দেশ দেন। তিনি টাকা না গুণে সই করতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পরেই হেড ক্যাসিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়। □

ইউ-বি-আই-এ লড়াই

গত সোমবার (১.৭.৮৫) থেকে কলকাতায় ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্কের সাতটি ইউনিয়নের কর্মচারীদের বিক্ষোভের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ওই সাতটি ইউনিয়নের তরফ থেকেই বলা হয়, তাঁরা একযোগে এই আন্দোলন করছেন।

ব্যাঙ্কের ইন্সপেকশন বিভাগকে ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর থেকে ৩, নম্বর ডেকার্স লেনে স্থানান্তরিত করার জন্যেই এই আন্দোলন। বি. ই. এফ. আই-এর সম্পাদক অমিতাভ নন্দী ও এন. সি. বি. ই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুবীর দাশশর্মা বলেন, সদর দপ্তরে প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও কেন ভাড়া করা বাড়িতে একটি বিভাগকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা ম্যানেজমেন্ট তাঁদের একবারও জানাননি। আসলে ওই বিভাগকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল ম্যানেজমেন্ট যেসব দুর্নীতিতে যুক্ত সেসব থেকে কর্মচারীদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া। ওই বিভাগের ১০০ জন কর্মীর ৯০ শতাংশই অফিসার। তার মধ্যে আবার ৬০ শতাংশ অফিসারকেই সারাদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয় ইন্সপেকশনের কাজে। সুতরাং বাকিদের জন্যে কেন মাসিক বাহাত্তর হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করা? নিশ্চয়ই কোন বদ উদ্দেশ্য আছে! এটা জাতীয় স্বার্থে মেনে নেওয়া যায় না।

তাঁরা বলেন, ব্যাঙ্কের বোকারো শাখায় ১৯৮৪ সালে ৬ কোটি টাকা গরমিল হয়েছে। ৩ মাস আগে আসামের জোয়াই-তে ৯৫ লক্ষ টাকার গরমিল ধরা পড়েছে। এরকম গরমিল প্রচুর আছে। আর ইউনিয়নগুলো এসব ধরছেন বলেই ম্যানেজমেন্ট এইভাবে একের পর এক বিভাগকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে ইউনিয়নগুলোর শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, ব্যাপকভাবে কর্মীদের সাসপেন্ড করা হচ্ছে। শো-কজের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। আর এসব করা হচ্ছে কোন কারণ না দেখিয়েই। এক বছর হলো নিয়োগ বন্ধ। বন্ধ প্রমোশনও। ইউনিয়নগুলোকেও সদর দপ্তর থেকে অফিস সরিয়ে নিয়ে যাবার

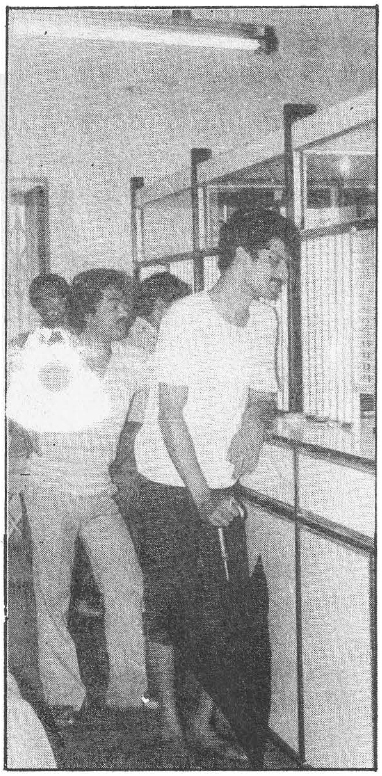

নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নগুলো সে নির্দেশ মানবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

অপরদিকে ইউ. বি. আই কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এই আন্দোলন নিষ্ফল ও অর্থহীন। গত বছর ব্যাঙ্কের কাজকর্মের এত বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়েছে যে সদর দপ্তরে কিছুটা স্থানাভাব হয়েছে। আর তার প্রতিকারের জন্যেই স্থানান্তরের ব্যবস্থা। সদর দপ্তর থেকে মাত্র ২৫০ মিটার দূরে। কারোরই অসুবিধা হবার নয়। □

ইউনিয়নবাজি

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে এ রাজ্যের ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে সি. পি. এম ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ. আই. বি. ই. এ-এর জনৈক কেন্দ্রীয় নেতা জানান। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে বিশৃংখলাকে সমর্থন জুগিয়ে কাজকর্মের গতিকে শ্লথ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জনসাধারণকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রান করানো হচ্ছে। যেখানে ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে ১০০ টাকার কমে কাউকে তারা ব্যাংক একাউন্ট খুলতে দেন না। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী, পাঁচ টাকা জমা দিলেই একাউন্ট খোলা যাবে। এই কাজ তারা বামফ্রন্ট সরকারের আশীর্বাদ নিয়েই করছেন। উদ্দেশ্য হল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা। এটা শুরু হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে।

এসব ছাড়াও রয়েছে বিশৃংখল কর্মচারীদের অপরাধকে ধামাচাপা দিয়ে, তাদের 'কমরেড' বানানোর প্রবণতা। বহু ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের একাংশের প্রত্যহ দেরি করে আসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অপমান হজম করতে হয়েছে, অফিস-আওয়ার্সেই অফিসের ভিতরে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটার অভিযান চলছে। কেউ প্রতিবাদ করলে, প্রকাশ্যেই হামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। স্বভাবতঃই ব্যাঙ্কের কাজকর্মও শিকেয় উঠেছে। বি. ই. এফ. আই ব্যাঙ্কে কম্পিউটার বসানোর বিরোধিতা করছে। অথচ ওঁরাই বোম্বাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কম্পিউটার বসাতে কর্তৃপক্ষের সংগে টেবিলে বসে চুক্তি করে এসেছেন। ওঁরা বলেছিলেন ওভারটাইম তুলে দেওয়া চলবে না। বরং বাড়াতে হবে। অপরদিকে অন্য ইউনিয়নগুলো বলেছেন, যে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার, সে দেশে ব্যাঙ্কের মত সংস্থার কর্মচারীদের ওভারটাইম করা অন্যায়। বরং সে জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করা হোক।

পিতার পরিবর্তে পুত্রের চাকরির নীতিকে বি. ই. এফ. আই সমর্থন করলেও অন্য ইউনিয়নগুলো তা সমর্থন করেনি। তাদের বক্তব্য, কর্মচারীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে কর্মচারীদের পুত্র-কন্যাদের শুধুমাত্র ব্যাঙ্কে চাকরি হবে। আর অপর শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে বঞ্চিত হবে, তা কি করে সমর্থন করা যায়?

সস্তায় ওইসব শ্লোগান তুলেও বি. ই. এফ. আই নেতারা ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হচ্ছেন। এমনকি যেটুকু প্রভাব ছিল তাও ক্রমশঃ ম্রিয়মান হতে চলেছে। ওঁরা বুঝতে পেরেছেন, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তাই গণতান্ত্রিক পথে আর না এগুনোই ভালো বলে মনে করছেন। অগণতান্ত্রিক পথে বি. ই. এফ. আই নেতারা এখন ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপনে রত। যেসব ব্যাঙ্কে ওঁদের ইউনিয়ন আছে, তার উৎস হল সন্ত্রাস। ব্যাংক নির্বাচনেও পেটমোটা মুখফুলো বি. ই. এফ. আই নেতারা ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নেয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। □

কমপিউটার যুদ্ধ

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু তা নিঃসন্দেহে মান্ধাতার আমলের। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংগে যদি ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার তুলনা করা হয় তবে দেখা যাবে আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শুধুমাত্র পুরাতনই নয়, অনেকক্ষেত্রে বাতিল করে দেবার যোগ্য। যেখানে অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে "প্লাস্টিক মাণি" ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যেখানে উন্নতশীল দেশগুলোতে ক্যাশ-লেস (Cashless) ও চেকলেস (Chequeless) সোসাইটির কথা ভাবা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এখনও ব্যাংকের টেলারে (Tallor) হাতে গুণে টাকা গ্রাহককে দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে এক একজন গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংক ১৫ থেকে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত সময় নিচ্ছে। আর যেসব ব্যাংকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলছে তার কথা না বলাই ভালো।

আমেরিকাতে ক্রেডিট কার্ড সিস্টেমে (Cheque card বা Debit Card) পুরো ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আয়ত্তে আনা হয়েছে। বৃটেন ও ইউরোপে চেক কার্ড পেমেন্ট পদ্ধতিতে সমস্ত ব্যবস্থাটা পরিচালনা করা হচ্ছে। ইউরোচেক (Eurocheque) পদ্ধতি বৃটেন ও ইউরোপে সমানভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে সেখানে পেমেন্ট নীতি গড়ে উঠেছে স্পেশাল চেকবুক ও প্লাস্টিক কার্ডের মাধ্যমে। বস্তুত, পুরো ব্যাপারটাই হয়ে থাকে আধুনিক কম্পিউটারের সাহায্যে।

আমাদের দেশেও ম্যাগনেটিক ইংক ক্যারেক্টার রিডারকে দেশের কয়েকটি আধুনিক শহরের ব্যাংকগুলোতে কাজে লাগানো হয়েছে। যদিও চেক ক্লিয়ারিং-এর কাজেই এমন ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু যেখানে সোয়েপ্ট (SWIFT) বিশ্বজুড়ে এসে গেছে অর্থাৎ (Society for World wide Interbank Financial Telecommunications) বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে আর সেখানে আমরা এখনও হাতে গুণে টাকা লেনদেন করছি।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দেশের ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দিল্লি, বোম্বাই ও মদ্রাজের ক্লিয়ারিং হাউসগুলোতে (Clearing House) কম্পিউটার চালু করেছেন। কলকাতার কয়েকটি বিদেশী ব্যাংক কম্পিউটার বসালেও চালু করতে পারছেন না ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার বিরোধিতার ফলে। এই ইউনিয়নটি সি. পি. এম সমর্থিত।

কম্পিউটার প্রবর্তন ও ব্যাংক কর্মীদের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া সংক্ষেপে বি. ই. এফ. আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংক ইউনিয়নের সভাপতি পরেশচন্দ্র ঢালীর বক্তব্য, সারাদেশে ব্যাংকে যদি ব্যাপকভাবে কম্পিউটার চালু করা হয় তবে ব্যাংকে কর্মরত বর্তমানে সাড়ে ছ লক্ষ কর্মীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে সাড়ে তিন লক্ষ কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। শুধু তাই নয়, কম্পিউটার বসানো হলে ব্যাংকে কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনাও নির্মূল হয়ে যাবে চিরদিনের মত। কয়েকবছর ধরে এমনিতেই তো ব্যাংকে কর্মী নিয়োগ বন্ধ আছে। বন্ধ আছে ব্যাংক সার্ভিসেস রিক্রুটিঙ বোর্ডের এক গোপন নির্দেশে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে অনেক শূন্যপদ দীর্ঘদিন পূরণ করা হচ্ছে না। ঢালী অবশ্য কবুল করলেন যে, অন্য ব্যাংকে কর্মী নিয়োগ বন্ধ থাকলেও পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংকে কর্মী নিয়োগ হয়।

এদিকে, এ. আই. সি. পি (ডাঙ্গেপন্থী) সমর্থিত অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (এ. আই. বি. ই. এ.) কংগ্রেস সমর্থিত ন্যাশানাল কনফেডারেশন অব ব্যাংক এমপ্লয়িজ (এন. সি. বি. ই) ও ইন্ডিয়ান ব্যাংক এমপ্লয়িজ সেন্টার (আই. এন. বি. ই. সি) ১৯৮৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর

ইন্ডিয়ান ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (আই. বি. এ)-এর সংগে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ওই চুক্তির ফলে ওই তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ব্যাংকে কম্পিউটার প্রবর্তনের শর্ত মেনে নিয়েছে। তার মানে, ওই তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ব্যাংকে কম্পিউটার বসালে তার বিরোধিতা করতে পারবেন না, তবে কম্পিউটার বসানোর পরে কোন কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে না। এ প্রসংগে ঢালী বলেন, প্রমাণ অচিরেই পাওয়া যাবে যখন আর ইউনিয়নগুলোর কিছুই করার থাকবে না। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও ওই তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে মোট চারটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭৯ ও ১৯৮৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

১৯৮২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর সি. রংগরাজনের নেতৃত্বে ব্যাংকে কম্পিউটার বসানোর বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি রংগরাজন কমিটি নামে পরিচিত। ওই কমিটি আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকে ব্যাপকভাবে কম্পিউটার বসানোর জন্যে সুপারিশ করেন। আর ওই সুপারিশের ভিত্তিতেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দিল্লি, বোম্বাই ও মাদ্রাজ-এর ক্লিয়ারিং হাউসগুলোতে কম্পিউটার বসিয়ে দিয়েছেন।

ঢালী বলেন, কম্পিউটার বসানোর ফলে কর্মীদের মনের উপর চাপ পড়ছে। কম্পিউটারে এক ঘন্টার কাজ এক দশমাংশ সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কর্মীরা না কাজ করেই মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছেন। এইভাবে একদিন তাঁরা অবসরও নেবেন। কিন্তু নতুন নিয়োগ বন্ধ হবেই।

ঢালী বলেন, কম্পিউটারের কয়েকটা ভয়াবহ দিকও আছে। যেমন, সাত-আট বছরের বেশি একটা কম্পিউটার কাজ করতে পারে না। পুরোনো কম্পিউটার থেকে নতুন কম্পিউটারে যাবতীয় হিসেব তুলে রাখতে হবে, একবার ভুল হলে সেই ভুল থেকেই যাবে। রিজার্ভ ব্যাংকে এইরকম বেশকিছু ভুল হওয়ায় আবার লোক দিয়ে খাতাপত্র লেখানো হচ্ছে। লোডশেডিং হলে কম্পিউটারের অবস্থা আরো খারাপ হবে। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। এতে গ্রাহকদের বিশেষ করে অল্প টাকার একাউন্ট যাঁদের আছে তাঁদের কোন লাভই হবে না। বরং তাঁদের একাউন্ট খোলাই বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্টে বৃহৎ পুঁজিপতিদের সুবিধা হয়

এদিকে অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক স্টাফ

ফেডারেশনের জনৈক নেতা বলেন, কম্পিউটার বসালে কোন ক্ষতিই হবে না। প্রথমে মনে হতে পারে ক্ষতি হবে। বরং কম্পিউটার চালু হলে গ্রাহকদের সুবিধা হবে। নতুন শিল্প গড়ে উঠবে ও বেকাররা চাকরী পাবে। সবশেষে তিনি বলেন স্টেট ব্যাংকে কোনরকম নিয়োগ বন্ধ নেই। এই বামপন্থী নেতা তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

এন. সি. বি. ই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুবীর দাশশর্মা বলেন, কম্পিউটার বসানোর জন্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সংগে একটা চুক্তি করেছি ঠিকই তবে ইউনিয়নের শর্ত পূরণ না হলে কোনরকম সহযোগিতা করবো না। □

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সি. বি. আই. তদন্ত

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বিমল জালানি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ব্যাপারে তদন্ত করার দায়িত্ব সি. বি. আই-কে দিয়েছেন।

সি. বি. আই-এর একজন অতি উচ্চপদস্থ অফিসার জানান, তাঁরা নির্দেশ পাবার পরেই তদন্তে নেমে পড়েছেন। ইতিমধ্যে সি. বি. আই কয়েকটি তদন্ত শেষও করেছেন। সেসব ক্ষেত্রে শো কজও করা হয়েছে। এর মধ্যে পনেরোটি প্রতিষ্ঠান ও কয়েকজন ব্যাংক অফিসারও আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কয়েকটি ব্যাংক থেকে ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে প্রায় দু'কোটি টাকা তুলে নেওয়ার।

সি. বি. আই-এর কেস নাম্বার আর. সি/১২/৮৪, আর. সি/৭/৮৩, আর. সি/৩/৮৩, আর. সি/৫৫/৮৩, আর. সি/৪৭/৮৩, আর. সি/৪০/৮২, আর. সি/৩৪/৮৩, পি. ই/১৭/৮৩, আর. সি/২/৮৩, আর. সি/২/৮৪। এই সবই কলকাতার কেস। এছাড়া তদন্ত শেষে আরো পাঁচটি ব্যাংক প্রতারণার কেস আদালতে বিচারের জন্যে পাঠানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অভিযোগ আছে, নিজের নাম গোপন করে অন্য নামে এ্যাকাউন্ট খুলে একটি অটোমোবাইল কোম্পানীর টাকা নিজের নামে জমা করার বা তুলে নেওয়ার।

এখন সি. বি. আই তদন্ত করছেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে বা রাজনৈতিক চাপে পড়ে কোন ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা? টাকা নেওয়ার পর কোন সংস্থা উঠে গেছে কিনা? ঋণের গ্যারান্টার ঠিক না ভুয়া? যথাযথ তদন্ত করে ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা? বিশদফা কর্মসূচীর জন্যে টাকা কিভাবে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সি. বি. আই. ইতিমধ্যে যেসব তদন্ত শেষ করেছে বা এখনও তদন্ত চালাচ্ছে তার কিছু কিছু যেমন – একটি ব্যাঙ্কের ফোর্ট উইলিয়ম শাখার একজন অফিসার প্রায় সত্তর হাজার টাকা তুলে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

একটি ব্যাঙ্কের হাওড়া শাখার এক কর্মীর সহযোগিতায় একটি চক্র চার লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে। সি. বি. আই-এর খাতায় এটির কেস নাম্বার আর. সি/৪০/৮২, জানা যায় ওই কর্মীর সহযোগিতায় অন্য একটি ব্যাঙ্ক থেকে ক্লিয়ার করার জন্যে পনেরোটি চেকে মোট ৫,০৩,৪৭২.৯৪ পয়সা জমা পড়ে। তার মধ্যে ৩১২৮০৬ নাম্বারের চেকে চার লক্ষ টাকা জমা পড়ে। সেই টাকাটাই আত্মসাৎ করা হয়। ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে সি. বি. আই. কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেছেন।

আর একটি ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার পাঁচজন জুনিয়র অফিসার একসংগে ষাট হাজার টাকার একটি লেটার অব ক্রেডিট খোলেন ২১.১১.৮২ তারিখে। উদ্দেশ্য, বিদেশে দুধ রপ্তানী। অভিযোগ এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে জাল কাগজপত্র দেখানো হয়েছে।

এই ধরনের আরো ৩০-৩৫টি কেস সি. বি. আই. তদন্ত শেষ করে এনেছে। □

স্বপ্নের বাঁশি-ওয়ালা

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবিঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

বাবা, আমি শান্তনু।

কোনো পঁচিশ বছর বয়সের ছেলে বিনে কারণে বাবাকে বারবার ডাকতে ভালোবাসে -- এমন কথা কেউ শুনেছে কোনদিন? বোধহয় না। অথচ সেই ইচ্ছেটাই বারবার আমার মনের মধ্যে কেমন যেন নড়েচড়ে ওঠে। যেমন ক'রে সুখের খোঁচায় জেগে ওঠে অবিশ্বাসী যৌবন, হারানো ছবির ভিতর থেকে নিষ্ঠুর স্মৃতি যন্ত্রণার পদ্ম এঁকে দেয় মনের শরীরে, তেমনি বাবা, তোমাকে বারবার ডাকার বাসনা আমার রক্তের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে খেলা করে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, তোমার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে শুয়ে পড়ি আবার। চুপি চুপি অপরাধীর মতো বলি, 'সেই গল্পটা বলো না বাবা -- সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প!'

কিন্তু জানি, তেমনি ক'রে আর কোনদিন আমি ডাকতে পারবো না-তোমাকে। আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে তোমার ঘরে, তোমার খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে এক মিনিট সময়ও লাগবে না আমার। আমি জানি, এখনো তুমি ঘুমোও নি। রাত্রে ঘুম আসতে খুব দেরী হয় তোমার। মাঝে মাঝে সারা রাত তোমার ঘরে আলো জ্বলে। আমি এ ঘর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাই, জানলার দিকে মুখ ক'রে ইজিচেয়ারে ব'সে আছো তুমি। তোমার মুখে জ্বলন্ত চুরুট। তার আভায় ভয়ংকর হয়ে উঠছে তোমার কপালের অগভীর নদী-নালাগুলো। জানলার বাইরে রাতের শেষ ট্রামগাড়ি শ্রান্ত শরীর নিয়ে ডিপোয় ফিরে যায়। ভাঙা চাঁদ ওঠে আকাশে -- ডুবে যায়। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর কার্নিশ পেরিয়ে জ্যোৎস্নার শরীর রাস্তায় নেমে আসার সুযোগ পায় না কখনো। ফুটপাথে খাটিয়া পেতে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখে রামশরণ গোয়ালা। আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে আলোর নৈকট্য থেকে অন্ধকারে স'রে যায় কোনো তৃষ্ণার্ত যুগল শরীর। মাতালের চিৎকার শোনা যায় আচমকা। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব কিছু দেখি। আমি জানি, আমার মতো তুমিও জেগে আছো বাবা। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে

ব'সে আছো ইজিচেয়ারে। কিন্তু আমি যা যা দেখছি, তুমি তার কিছুই দেখতে পাচ্ছো না।..... মাঝে মাঝে আমার কেমন যেন ভয় হয়।

মনে হয়, হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখতে পাবো -- তুমি আমার বড়ো কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছো। আমি ন'ড়ে উঠলেই তুমি তোমার সবল হাতখানা আমার কাঁধের উপর রেখে বলবে -- 'এবার শুয়ে পড় শানু -- বেশী রাত জেগে শরীর খারাপ করিসনে --'

অথচ জানি, এমন আর কোনদিন হবে না।

আমার পঁচিশের রক্তে আজ আর শৈশবের হ্যামলিনের বাঁশি বাজে না।

কতোবার ভাবি, তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। তোমার ঘুমন্ত শরীরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মিলিয়ে নেবো নিজেকে।

কিন্তু পারিনি বাবা।.....

আমার রক্ত, তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার রক্ত আমাকে তোমার কাছে যেতে দেয় নি। তিলে তিলে আমাকে সে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তোমার কাছ থেকে।

তুমি কি সে কথা জানতে না বাবা?

জানো বাবা, ছেলেবেলাকার সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্পের মতো আরো একটা ঘটনা আমার মনে ভীষণ ছাপ রেখে গেছে।.....

ছেলেবেলাকার কতো কথাইতো মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো ঘটনার স্মৃতি আজও কেমন যেন অলৌকিকভাবে আমার রক্তে লেগে আছে। স্মৃতি যেন এক আশ্চর্য ছাঁকনি। প্রয়োজনের জিনিসটুকু সযত্নে তুলে রেখে বাকি সব কিছু অবহেলায় অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।··

স্টিমারে ক'রে গংগা পার হ'চ্ছিলাম আমরা।

তখন সকাল। সূর্য উঠছে আকাশ আলো ক'রে। নদীর ঘোলা জলে ছলছল করছে দিন। কাছে দূরে অজস্র মাছ ধরার নৌকো যায় পাল উড়িয়ে। আগে আমি কখনো এমনটি দেখি নি!

রাত্রে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। ভোর হ'তে না হ'তে ট্রেন ছেড়ে বালির পথ ধ'রে স্টিমারে এসে উঠেছিলাম। ভোরের হাওয়ায় আমার শীত ক'রছিলো। হাত দু'টো ভীষণ ঠান্ডা -- দাঁতে দাঁত লেগে কাঁপুনি উঠছিলো মাঝে মাঝে। চোখ দু'টো ঘুম না হবার জন্য জ্বালা ক'রছিলো অনবরত।

সেই সময় বাবা, তুমি একটা মাফলার দিয়ে আমার মাথা আর কান দু'টো ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলে।

আর সেই সাদা পাল ওড়ানো নৌকোর ঝাঁক, আলোকময় নদীর জল আর ভীষণ উজ্জ্বল নীল আকাশ -- সব কিছু অস্পষ্ট ক'রে দিয়ে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এসেছিলো আমার।.....

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার মাকে ঘিরে অসংখ্য উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সেই সব দৃষ্টি কখন যেন আগুন হ'য়ে আমার মাকে ঘিরে ধরে। আগুনের উজ্জ্বল শরীরে কেমন ক'রে হারিয়ে গেলো আমার মা!

আমাদের সংগে মামারবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মা আর ফিরে এলো না! এক ঝটকায় তুমি তখন আমাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরেছিলে বাবা। তোমাকে কি ভীষণ অসহায় লাগছিলো তখন।

স্টিমারে জোরে ভেঁপু বাজছিলো। আর আমি তোমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কেঁদেছিলাম অনেকক্ষণ ধ'রে।.....

মনে মনে কতোবার বলেছি -- 'তুমি একটু কাঁদো বাবা -- তুমি একটু প্রাণ ভ'রে কাঁদো আমার মতোন -'

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনদিনও আমি তোমার চোখে জল দেখলাম না বাবা। মাঝে মাঝে মনে হ'তো, কি নিষ্ঠুর তুমি!

সকালে-সন্ধ্যায় পড়া নিয়ে কতোদিন মার খেয়েছি তোমার হাতে। ছুটির দুপুরগুলোতেও নিস্তার মিলতো না। অংক, ট্রানস্লেশনের খাতায় লালকালির দাগের সংগে সংগে লাঞ্ছনাও বেড়ে উঠতো স্কেল মেপে। অথচ সেই তুমিই কেমন পাল্টে যেতে রাত্রিবেলা। আমার গায়ে হাত রেখে তুমি তখন সম্রাট নিরো, জুলিয়াস সিজার আর অশোক আকবরের গল্প ব'লতে। গল্পের সংগে সংগে আমি কতোদিন চ'লে গেছি সাহারার মরুদ্যানে, উত্তর মেরুর নির্জন বরফের রাজ্যে আর ভূমধ্য সাগরের বুকে উড়ে যাওয়া এ্যালবার্টাসের দুঃসাহসী ডানায়। পিসার হেলানো টাওয়ার, স্ফিংসের আশ্চর্য মূর্তি, গ্রীসের অলিম্পিয়ার কথা সেই বালক বয়সেই জানা হয়ে গিয়েছিলো আমার। কিন্তু সব চাইতে ভালো লাগতো, হ্যামলিনের সেই আশ্চর্য লোকটার গল্প শুনতে -- যার বাঁশি শুনে ইতর প্রাণীর দলও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় -- অথচ যার পরিচয় কেউ জানে না। আমি যেন চোখের সামনে সেই লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেতাম। তার পরনে সবুজ সিল্কের ঢোলা হাতা জামা আর হলুদ রঙের বিচিত্র এক প্যান্ট। পায়ে নাগরা জুতো। মাথার লাল পাগড়ির কোণে এক ধূসর রঙের পালক গোঁজা। কত রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি তাকে।

ঘুমের মধ্যেও আমি যেন তার বাঁশি শুনতে পেতাম। তাকে অনুসরণ ক'রে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতাম নদী পাহাড় পেরিয়ে অনেক -- অনেক দূরের পথে।...

ঘুম ভেঙে দেখতাম বাবা, তুমি আমার পাশে নেই। সমস্ত ঘর অন্ধকার। আমার কেমন যেন ভয় ভয় ক'রতো তখন। চোখের সামনে দেখতে পেতাম, এক নিষ্ঠুর চিতা দাউ

দাউ ক'রে জ্ব'লছে সমস্ত ঘর জুড়ে। পট্‌পট্‌ শব্দে কাঠ ফাটছে। বাতাসে কি বিশ্রী দুর্গন্ধ। অথচ ওরই আড়ালে শুয়ে আছে আমার মা -- রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যাকে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রতাম প্রাণপণে! আমার ভীষণ কান্না পেতো তখন। দম বন্ধ হ'য়ে আসতো। মনে হ'তো আমি বুঝি ম'রে যাবো!

আর সেই সব মুহূর্তে বাবা, তুমি কেমন ক'রে যেন টের পেয়ে যেতে, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। জানালার দিকে মুখ ক'রে ব'সে থাকা ইজিচেয়ার থেকে উঠে এসে তুমি ঘরের নীল আলোটা জ্বেলে দিতে।

তারপর আমার কাছে এসে গলার স্বরে অনেক আদর ঢেলে দিয়ে ব'লতে -- 'কিরে, ঘুম আসছে না?'

আমি মাথা নেড়ে ব'লতাম -- 'ভেঙে গেলো --'

আমাকে নিয়ে তুমি তখন বাইরে যেতে। ঠান্ডা জলের হাত বুলিয়ে দিতে ঘাড়ে-গলায়, চোখে-মুখে। তারপর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমার চুলে বিলি কেটে দিতে অনেকক্ষণ ধ'রে।...

তখন, জানো বাবা, তখন আমার কেমন যেন মনে হ'তো, তুমিই সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। তোমার পেছন পেছন আমি চ'লে যেতে পারি অ-নেক দূর পর্যন্ত।

আস্তে আস্তে আমি বড়ো হ'য়ে উঠছিলাম।

কিন্তু তখনো তুমি বুক দিয়ে আগলে থাকতে আমাকে -- যেন আমি সেই ছোট্টটিই আছি।..

নতুন মা-ও ভীষণ ভালোবাসতো আমাকে।

লোকের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় কেমন বুক টান ক'রে ব'লতো -- 'এই আমার ছেলে শানু --'

তোমার অফিস থেকে ফিরতে দেরী হ'লে নতুন মা মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কান্ড ক'রতো আমাকে নিয়ে। কখনো কখনো ব'লতো -- 'হ্যাঁরে, শানু, আমি যদি কখনো হারিয়ে যাই, তুই খুঁজে নিতে পারবি আমাকে?'

আবার কখনো কখনো হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রতো -- 'একটা কথা সত্যি ক'রে ব'লবি আমাকে? বলতো, তোর আগের মা বেশী সুন্দর ছিলো, না আমি বেশী সুন্দর? সে তোকে বেশী ভালোবাসতো, না আমি বেশী ভালোবাসি?' নতুন মা আমার দিকে তাকিয়ে কথা ব'ললেও আমি বুঝতে পারতাম, নতুন মা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

আমি কি উত্তর দেবো বুঝতে পারতাম না।

কিন্তু কিছু ব'লবার আগেই নতুন মা ব'লতো -- 'তুই তো আমার শত্তুর! তোকে যদি আমি এখন গলা টিপে মেরে ফেলি?'

অথচ তারপরেই বুকে জড়িয়ে ধ'রে আদরে আদরে অস্থির ক'রে তুলতো আমাকে।... আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতো তখন। লজ্জা লাগতো।... কিন্তু তোমাকে কোনদিনই এসব কথা কিছু ব'লতাম না।

আমার মনে হতো, এসব কথা শুনলে নতুন মাকে ভীষণ ব'কবে তুমি। আমার ভয় হ'তো।.....

আর মনে হ'তো নতুন মা খুব দুঃখী -- সবার চাইতে বেশী দুঃখী।

সেবার পূজোর ছুটিতে আমরা সবাই মিলে পুরীতে বেড়াতে গেলাম। কলকাতায় রাতে আমি নতুন মা'র কাছেই শুতাম। তুমি পাশের ঘরে আলাদা শুতে। কিন্তু পুরীর হোটেলে একটা ঘরেই থাকার বন্দোবস্ত হ'লো আমাদের।

সেদিন দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ধ'রে সমুদ্রে স্নান ক'রেছি আমরা। নতুন মা আর তুমি দু'হাত ধ'রে অল্প জলে স্নান করালে আমাকে। তারপর আমাকে পাড়ে বসিয়ে রেখে নতুন মা'কে নিয়ে আবার জলে নেমে গেলে তুমি। নতুন মাকে ভীষণ খুশি খুশি লাগছিলো তখন। মাঝে মাঝে এক একটা বিরাট বড়ো ঢেউ এসে তোমাদের ঢেকে দিচ্ছিলো। জল স'রে যেতেই দেখছিলাম, নতুন মা'র দু'চোখে ভয় আর আনন্দ একসংগে কেমন স্বচ্ছন্দে খেলা ক'রছে। ঢেউ-এর ভয়ে নতুন মা মাঝে মাঝে তোমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রছিলো। অথচ আমার মনে হ'চ্ছিলো, আসলে ঢেউটা কিছু নয় -- নতুন মা ঢেউকে সামনে রেখে ভয়ের নাম ক'রে ইচ্ছে ক'রেই জড়িয়ে ধরছে তোমাকে।... আমার ভীষণ ভালো লাগছিলো তখন!

মায়ের কথা মনে প'ড়ছিলো।...

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম, বিস্তীর্ণ গংগার বুক জুড়ে অসংখ্য মাছ ধরার নৌকো। আলোকিত আকাশ যেন ডানা মেলে নেমে আসছে জলের উপর।...দূরে কোথায় কারা যেন হরিধ্বনি দিতে দিতে অন্ধকারের দিকে চ'লে যায়। গংগার জলে নিভে যায় নিষ্ঠুর চিতা।...

বিশ্বাস করো বাবা, তবু সেই মুহূর্তে তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার শৈশব বিদায় নিয়েছিলো সেদিন।

সেদিন রাতেই একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো আমার।.....

স্বপ্ন দেখছিলাম, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা বাঁশি হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে তার লাল পাগড়ির কোণে গুঁজে রাখা ধূসর রঙের পালক।.....

ঘুম ভেঙে দেখতে পেলাম, তুমি বিছানায় ব'সে আছো। তোমার কোলের কাছে মুখ নিচু ক'রে কাঁদছে নতুন মা।...

নতুন মা'র গায়ে জামা নেই। দারুণ হাওয়ায় গায়ের আঁচল উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আমার কেমন যেন ভয় লাগছিলো। তবু ঘুমের ভান ক'রে নিঃশব্দে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

নতুন মা কাঁদতে কাঁদতে বলছিলো -- 'পারবো না, আমি কিছুতেই পারবো না -- আমি পাগল হ'য়ে যাবো --'

তুমি তখনও নিষ্ঠুর ঋষির মতো নিশ্চল হ'য়ে ব'সেছিলে।

শুধু আস্তে আস্তে ব'লেছিলে -- 'চুপ করো, শানু উঠে প'ড়তে পারে --'

--'উঠুক --

--'ছেলেমানুষী ক'রো না মিতু... আমি তো তোমাকে ঠকাতে চাইনি! তুমি তো জানো, শানু না থাকলে তুমি কখনই আমার জীবনে আসতে না --'

--'কিন্তু আমার নিজের ব'লে কি কিছুই থাকতে নেই?'

--'কে ব'ললে নেই? আমার সংসারের সবই তো তোমার --'

--'তুমি কিছুতেই বুঝতে চাও না আমাকে -- শুধু কথার জাল দিয়ে মিথ্যে ক'রে ভুলিয়ে রাখতে চাও --'

নতুন মা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিলো।

বাবা, তোমাদের অগোচরে আমি দেখছিলাম, তুমি ভীষণ নিস্পৃহের মতো নতুন মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছো।...

কলকাতায় ফিরে ঝড়ের মতো কেটে গেলো ক'টা মাস।

এই ক'টা মাসে নতুন মা'র ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখতে পাই নি আমি। শুধু তোমার সংগে কথাবাতটা ক'মে গিয়েছিলো অনেক। তুমি আরো গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলে। আরো বেশী ক'রে নজর দিতে শুরু ক'রেছিলে আমার দিকে।... তারপর একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি নতুন মা'কে দেখতে পেলাম না। আর দেখতে পাইওনি

কোনদিন।...

আমার কেমন যেন মনে হ'য়েছে, সেই ভয়ানক সুর, যে সুরে সবাই নিজেকে ভুলে যায়, সেই সুরের পথ ধ'রে নদী-পর্বত-সমুদ্র-মরুভূমি পিছনে ফেলে রেখে এক নতুন দেশের দিকে এগিয়ে চ'লেছে নতুন মা।... আর তখনই আমার প্রথম মনে হয়েছে, আমার শৈশবের প্রিয় কল্পনায় বোধহয় একটা ভুল র'য়ে গেছে কোথাও।

হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালাকে বোধহয় অতো সহজে চেনা যায় না।

আমাদের বাড়ির পিছন দিকে যে ন্যাড়া পার্কটা আছে, তুমি বোধহয় কখনও লক্ষ্য করোনি বাবা, সেই পার্কটার কোণাকুণি দু'টো গোলপোস্ট লাগিয়ে পাড়ার ছেলেরা সেটাকে তাদের ফুটবল গ্রাউন্ড বানিয়ে নিয়েছিলো।... পার্কটার চারদিকে গোটা কয়েক কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিলো।

গ্রীষ্মকালে তাদের ফোটা ফুলের রঙে সমস্ত পার্কটা যেন ঝকঝক ক'রে উঠতো। তারপর কি যে হ'লো, আস্তে আস্তে গাছগুলো কেমন যেন শুকিয়ে গেলো। একদিন লরি বোঝাই হ'য়ে তাদের মৃতদেহগুলোকে কারা যেন সংকারের জন্য নিয়ে গেলো কোথায়!

শুধু একটা গাছ আজও প্রহরীর মতো একা একা দাঁড়িয়ে আছে পূব কোণে। সমস্ত গ্রীষ্মকালটা সারা গায়ে আগুন লাগিয়ে গাছটা যেন কিসের প্রায়শ্চিত্ত করে আজও।...

আর গোলপোস্ট দু'টোর একটা কবে যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো, কেউ তার খোঁজ রাখেনি!

একদিন দুপুরে কলেজ থেকে ফেরার পথে আমি দেখেছিলাম, দুরন্ত রোদে মৃতের মতো নিঃসংগ ভেঙে পড়া বাকি গোলপোস্টটা যেন প্রচন্ড ক্রোধে জ্বলছে। দেখে আমার কেমন যেন ভয় হ'য়েছিলো বাবা। মনে হ'চ্ছিলো, ওই ভাঙা গোলপোস্ট, ওই নির্জন কৃষ্ণচূড়া গাছ আর তুমি -- সবাই কেমন যেন এক হয়ে গেছো!

অথচ আর এক জ্যোৎস্নালী কুয়াশা-ভেজা রাতে ওদের দেখে আমার বড়ো কষ্ট লেগেছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম, ওরা বড়ো শ্রান্ত, বড়ো নির্জন আর ভীষণ অসহায়!...

আমার তখন কান্না পেয়েছিলো বাবা।

তোমার নির্জনতা বোধকে আমি হারকিউলিসের মতো শক্তি দিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছি। আমার উৎসাহ দিয়ে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছি তোমার সারাজীবনের শ্রান্তি। আমার একমাত্র বাসনা, হিমালয়ের মতো দৃঢ়তা নিয়ে আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো।

হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালাকে মলিন সাজে আমার কিছুতেই ভালো লাগে না বাবা! অথচ কতো প্রাচীন মূল্যবোধ একদিন অলক্ষিতে মহাসমুদ্রে ডুবে যায় শ্রান্ত নক্ষত্রের মতো। ধূসর সন্ধ্যায় ধূলো ওড়ানো মাঠের পথ বেয়ে উদাসীন ঘন্টাধ্বনির মতো দিগন্তের অন্ধকারে হারিয়ে যায় বিষণ্ণ অতীত। আর দীর্ঘশ্বাসের করতলে মুখ রেখে স্মৃতির সুগন্ধ খোঁজে বিলাসী মানুষ। মনে আছে বাবা, প্রতি মহালয়ার ফুল ফোটানো ভোরে কেমন ক'রে আমার ঘুম ভাঙাতে তুমি? ঈথারে ভেসে আসা চন্ডীপাঠ শুনতে শুনতে আমি যখন প্রতিমুহূর্তে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতাম, তুমি তখন জানলার দিকে মুখ ক'রে ইজি চেয়ারে ব'সে মাঝে মাঝে চুরুটে আনমনা খেয়ালী ঠোঁট ছোঁয়াতে। আমার তখন মনে হ'তো, তুমি যেন কি একটা ভীষণ দামী জিনিস হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছো বাবা।... ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে দেবার পরেই তোমার মনে প'ড়েছে, খামের গায়ে তুমি কোন ঠিকানা লিখে দাও নি।...

মাঝে মাঝে মনে হয়, সে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তুমি হয়তো আমাকেই দিতে চেয়েছিলে।

কিন্তু চন্দনা কিছুতেই সে কথা মেনে নিতে চায় না।...

আমার কোন কথাই তো তোমার কাছে লুকোনো নেই বাবা। অথচ বলি বলি ক'রেও চন্দনার কথা এতদিন ধ'রে তোমাকে কিছুতেই বলা হ'য়ে ওঠেনি। কেন জানো? আমি ভেবেছিলাম, আমার বিশ্বাস আর আমার সংকল্প দিয়ে চন্দনার বাসনাকে নিষ্ঠুরের মতো ভেঙে তছনছ ক'রে ফেলবো আমি। তারপর বুকে হাজার নক্ষত্র-জয়ের অশেষ অহংকার নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো আবার।

অথচ আমার কথা শুনে চন্দনা তার দু'চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়ায় উড়ন্ত পরীর মূর্তির দিকে।...

দূর সমুদ্র আর নির্জন নীল দ্বীপের অন্ধকার নেমে আসে আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে। জাহাজ ঘাটে শিকল-বাঁধা জাহাজের ভেঁপু বেজে ওঠে বারবার। সোনার কাঠি রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় অসহায় রাজকন্যা মৃত্যুর মতো গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকে। হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়, মায়ার পাহাড় পেরিয়ে ছুটে চলে রূপকাহিনীর পক্ষীরাজ ঘোড়া। যাদুকরের ডুগডুগি বেজে ওঠে কোথাও। রক্তের মধ্যে করতালি দিয়ে হেসে ওঠে সাঁওতাল শিশুর দল।...

আর শ্রান্ত জ্যোৎস্না গায়ে মেখে একসময় চন্দনা ব'লে ওঠে -- 'আমার বিধবা ঠাকুমার তোরংগে পুরোনো আমলের অনেক জমকালো শাড়ী আছে শান্তনু। আমার থান পরা বুড়ি ঠাকুমা মাঝে মাঝে সেগুলোকে নেড়ে চেড়ে দ্যাখেন, অহেতুক গোছগাছ করে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তোরংগে বন্ধ ক'রে রাখেন। একে তুমি সুখ বলো?'

আমার চোখের সামনে তখন অজস্র পাল তোলা নৌকা। ফুলের মতো ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় কোথায় চ'লে যায় হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। বাতাসে শেষবারের মতো ভেসে আসে অলৌকিক হরিধ্বনি।...

চন্দনার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ব'ললাম -- 'আমাকে তুমি ভুলে যাও চন্দনা' -- এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলো চন্দনা। তারপর আচমকা ব'লে উঠলো -- 'তা আমি কিছুতেই পারবো না -- আমি পাগল হ'য়ে যাবো শান্তনু --'

সংগে সংগে আমার আর একজনের কথা মনে প'ড়ে গেলো বাবা।...

সমুদ্রের হাওয়ায় তার খোলা গায়ের আঁচল উড়ছিলো। অস্পষ্ট আলোয় সে এক পুরুষের কাছে হয়তো বা পূর্ণতা চেয়ে প্রত্যাখ্যান পেয়েছিলো। নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রেও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারেনি সে!...

বাবা, চন্দনা তখন আমার হাত দু'টো ওর দু'হাতের মুঠোয় ভীষণ জোরে চেপে ধরে বলেছিলো -- 'সময় বড়ো নিষ্ঠুর পুরুষ শান্তনু। তোমার চলার পথ তোমার নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। তুমি দ্যাখো, আমার মন, আমার এই শরীর -- সবকিছু তছনছ ক'রে দ্যাখো -- এখানে শুধু তোমার নাম লেখা। এর ডাক কি তুমি শুনতে পেয়েও অবহেলা ক'রবে শান্তনু?'

জানো বাবা, সেদিন রাতে আমি শেষবার স্বপ্ন দেখলাম সেই অলৌকিক বাঁশিওয়ালাকে।...

তার মলিন পোশাক পরিচ্ছন্ন হ'য়েছে। পায়ে চকচক ক'রছে নূতন নাগরা জুতো। লাল পাগড়ির কোণে ফুরফুর ক'রে উড়ছে ধূসর রঙের পালক।... তার মুখে কি এক আশ্চর্য অনুভবের হাসি!...

আমি দেখলাম, সে মুখ তোমার নয় বাবা, সে মুখ আমার নিজের। □

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

।। আট ।।

বাঙালীর বড় বদনাম 'ভেতো' ব'লে – ভীতু শব্দটাও প্রায় এর সংগে অনেকে জুড়ে দিয়ে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অথচ গড়ে শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালী ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করবার জন্য কুড়ি-কুড়ি নিদর্শন জড়ো করেন। নিজেকেও তার ব্যতিক্রম ভাবতাম না ছোটবেলায়। কিন্তু ভেতরের আত্মগ্লানির তাড়নাই বোধকরি আমার গ্ল্যান্ডুলার বিস্ফারণ ঘটিয়ে লম্বা করল সেইসংগে স্বাস্থ্যচর্চার দৌলতে ভারতশ্রী না করলেও বিশ্রী দশা ঘুচিয়ে দিয়ে মাম্‌পশ্য ক'রে তুলেছিল। তবে দেবীপ্রসাদকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন নিজের সফরীত্ব চিত্তপটে প্রকটিত হ'ল। বাজপাখির কাছে দুগেগা টুনটুনি! অবশ্য তাঁকে চাক্ষুষ করার আগে পত্রালাপ চলেছিল বেশ কিছুকাল ধরে

যোগাযোগের মূলসূত্র তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বেদেনী, মন্বন্তর, পঞ্চগ্রাম ইত্যাদি প্রকাশের কাছাকাছি সময়ে একদিন বললেন, 'মদ্রাজ থেকে দেবীপ্রসাদ চিঠি লিখেছেন তাঁর বই-এর জন্য একজন ভালো প্রকাশক দরকার। তোমার কথাই ভাবছিলাম। চিঠির জবাব দিতে হবে তাড়াতাড়ি নইলে টেলিগ্রাম ক'রে বসবে হে! মিত্রালয়ের নাম লিখে দিই কি বলো?

আমার ওপর উনি হামেশাই চটে যান। বকুনি খাই নিজের দোষেই। আবার সব ব্যাপারেই সর্বাগ্রে আমাকে এগিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি নেই।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাসাতে বসে সেদিন এই প্রসংগে কথা হল তার সপ্তাহখানেকের মধ্যে হাজারিবাগ রোডে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বাংলোতে ঠিকানা পরিবর্তিত খামে চিঠি পেলাম। খুব তাজ্জব লাগল এত তৎপরতা শিল্পীর চরিত্রে, কল্পনা করি নি। মদ্রাজ গভঃ স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট্-এর অধ্যক্ষ এবং ভারত বিখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বাংলা হস্তলিপির পাঠোদ্ধার রীতিমত গবেষণার বস্তু! চটপট্ জবাবে **জানালাম** কলকাতায় ফিরে তাঁর পাণ্ডুলিপি পেলেই চলবে। টেলিগ্রাম, প্রিপেড টেলিগ্রাম দ্বারা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে আমার অন্যান্য অ-কাজ, কাজ–সবই ডুবতে বসল। তাঁর দাবি এমনই প্রবল। কি করা যায়? 'পিশাচ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার, তার প্রুফ দেখা তো আছেই। পরন্তু মদ্রাজ থেকে আসা গেরুয়া-মেটে মিশ্র রং-এর কাপড় দিয়ে বাঁধানো মলাটের ডালার ওপর তাঁর আঁকা একটি স্কেচ্! নায়কের কল্পিত চিত্র! লেখক তথা শিল্পীর নির্দেশ –– ঠিক ওইরকমটিই হ'তে হবে মলাট। আমার ললাটে এ কী দুর্গ্রহ! এ তাবৎ আমার পছন্দমত কভার ডিজাইনেই বই প্রকাশিত হয়েছে। অগত্যা বড় বাজারের গলি-গলি ঢুঁড়ে স্পেশিফিকেশন মিলিয়ে কাপড় কেনার জন্য দপ্তরীর সংগে আমাকেই যেতে হ'ল। 'পিশাচ' প্রকাশিত হ'ল এবং প্রথম মুদ্রণে বিস্তর ছাপার ভুল নিয়েই অল্পদিনে ফুরিয়ে গেল। দেবীপ্রসাদ তাঁর বন্ধু তারাশংকরের কাছে মুদ্রণ প্রমাদের অভিযোগ করে চিঠি দিলেন। সেই সুযোগে তারাশংকর নিজের বই-এর ভুলভ্রান্তির জন্যও ধমকানির চিঠি পাঠালেন। নির্দেশ পিশাচ দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ (পঞ্চগ্রামের প্রুফও) যেন কৃষ্ণদয়াল বসুকে দিয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়। প্রকাশনার সূত্র ছাড়িয়ে দেবীপ্রসাদের সংগে চিঠিপত্র শিল্প ও ফোটোগ্রাফি বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

চিঠি লিখতে আমার ভালো লাগে, পেতে আরও বেশি ভাল লাগে, তাই উৎসাহিত হয়ে লিখি। এই অবস্থায় দোকানে একদিন পৌঁছেই শুনলাম, দেবীপ্রসাদ কলকাতায় এসেই আমার সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে একবার এম. সি. সরকারের দোকানে গেলেন তখনও না পেয়ে শেষে টেলিফোন নম্বর রেখে ফিরে গেছেন হোটেলে। ফোনে যোগাযোগ করতেই উনি উৎসাহিত ভাবে সাড়া দিলেন– 'চলে আসুন বিকেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ যখন খুশি, আমি কোথাও যাব না মশাই।'

দেবীপ্রসাদ কলকাতার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মুখে মুখে প্রবাদের মত প্রচারিত। কেউ কেউ বলেন এক সময়ে তিনি নাকি কুস্তিগীরদের পট্‌কে দিতেন। তাঁর হোটেলে সান্ধ্য মদের আড্ডায় অনেকে নাকি মাত্রাধিক্যের ফলে মেঝেতে গড়াগড়ি যান ইত্যাদি কত কাহিনী। তিনি ত্রিশের দশকে কলকাতা ছেড়ে যাবার পর মাঝে মধ্যে যখন আসেন শম্ভুনাথ পন্ডিত স্ট্রীটে নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও হোটেলেই ওঠেন।

এ হেন প্রবাদ পুরুষের সংগে দেখা করতে যাব ভাবতেই যেন বুক কাঁপে। সেদিন আমার গায়ে হাফ শার্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে সাক্ষাতের যোগ্য বেশ বলা যায় না। একা-একা যেতে ঠিক ভরসা হচ্ছে না। তবু ––!

টক্-টক্ শব্দ করতেই দরজা খুলে নিমা-পায়জামা পরিহিত ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ ইন্দ্রলুপ্ত শোভিত পুরুষটি সামনে দাঁড়ালেন। চোখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কণ্ঠে গম্ভীর আওয়াজ কি চান?

নমস্কারের সংগে সংগে নিজের নমোচ্চারণ করলাম। সবটুকু কানে না তুলে উনি একটু উষ্মা প্রকাশ করলেন 'কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগেই তো গৌরীশংকরবাবু বললেন, নিজে আসবেন আজ! আমি ওঁর অপেক্ষাতেই বসে আছি!'

আমার মুখ থেকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হাত বাড়ালেন 'চিঠি-ফিটি কিছু দিয়েছেন নাকি?

হাতের কব্জি থেকে কাঁধ পর্যন্ত কী অপূর্ব ভাস্কর্য!

আমি কুণ্ঠিত। হাসিও পাচ্ছে। বললাম আজ্ঞে, আমি, আমিই গৌরীশংকর।

–– অ্যাঁ? বলেন কি মশাই!

চমকে, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বার কয়েক চোখ বুলিয়ে মাপতে মাপতে রংগমঞ্চে পর্দা ওঠার মত মুখমন্ডল উদ্ভাসিত ক'রে বললেন বটে! এতদিন ধরে আমাকে খুব ঠকিয়ে এসেছ! যেমন ভারিক্কি নাম তেমনি চিঠির বয়ানে তো প্রবীণের মতো পাকা প্যাঁচ বাবা! বয়েসের বেলায় লুকোচুরি!

প্রথম দিনের সেই আলাপ খুব বেশিক্ষণের হয় নি। দু'জনে ম্যাডান স্ট্রীটের দোতলার খোলা বারান্দায় চেয়ারে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর উনি যখন বললেন –– 'লন্ঠন এসেছে। চলো এবার গলা ভিজোনো যাক।' তখন দু-হাত জোড় ক'রে জানালাম – 'মাফ চাইছি। আপনার বৌমার কাছে কথা দেওয়া আছে–– ইত্যাদি

চোয়ালের হাড় একটু যেন উঁচু হ'ল –– সতী! তুমি কি রকম আর্টিস্ট

হে! সিগ্রেট খাও না, গান করো না। তা হলে করো কী? আমি তো ভাবতেই পারি না, এইসব বিধিনিষেধ দিয়ে বেরসিকের মতো বাঁচার কী মানে হয়। আবার সাহিত্য করো! অ্যাঁ!

আমার মত বয়সে নৌকোয় যেতে যেতে কোনো স্নানরতা সুন্দরী মেয়ে দেখলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব সাঁতারে উনি কিভাবে যথাস্থানে ভেসে উঠে ইত্যাদি আদিরসাত্মক কাহিনী ফেঁদে বসলেন তার সত্য কল্পনার মাত্রা নির্ণয় না ক'রেও মুখ বুজে শুনতে মন্দ লাগছিল না। মনে হচ্ছিল কথা দিয়ে ছবির বলিষ্ঠ রেখা টেনে চলেছেন। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে বাঁশের বাঁশি হাতে ক'রে আনলেন, বললেন -- জানো ভোরবেলায় আজও উঠি আর বাঁশির সুর শুনিয়ে দিন শুরু করি আর সুরায় শেষ। সুর আর সুরা জীবনেরই অংগ!

এক সময়ে এলেন কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার। লম্বা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা। তাঁকে দেখে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করলেন -- 'এই আর এক বেরসিক। তোমার মতো।' দেবীপ্রসাদের উদার পানীয়ের একটি বিন্দুও যার ঠোঁট স্পর্শ করে নি অথচ যে দিনই গিয়েছি দেখি গুরুর ঘরে শিষ্যটি নিজের আসনে বসে। কখনো বা সিগারেটের ঢাকনার পাত্‌লা গোল চাক্‌তিকে হাতের কৌশলে ঘোড়ার শেপ দিচ্ছেন কিম্বা কাগজের টুকরোয় আঁকি বুকি কাটতে ব্যস্ত। কালীকিংকরের উপস্থিতি নির্বাক। নেহাত কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করলে তিনি মুখ খোলেন না। অবশ্য গুরুর কখন কি দরকার সেদিকে ঠিক নজর আছে -- যথাসময়ে এটা-ওটা জুগিয়ে যাচ্ছেন। কালীকিংকরের একক কোনো প্রদর্শনী দেখি নি। কিন্তু সাময়িক পত্রে তাঁর illustration, স্কেচ **আমাকে** আকৃষ্ট করে।

ওই আসরে আলাপ হল দেবীপ্রসাদের অনুরাগী গোপাল ঘোষের সংগে যাঁর আঁকা ছবি আমাকে মুগ্ধ করে। গোপালবাবু ঘন-ঘন পেগ নিঃশেষ করতে এতই মনোযোগী যে অন্য প্রসংগে মুখ খোলার বিশেষ ফুরসৎ পান না। এই আসরে আমার ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। তবে কফি হাউসের বন্ধুদের অনেকেই দেবীপ্রসাদের সংগে পরিচিত হবার জন্য উৎসুক। একদিন মণীন্দ্র মিত্রকে নিয়ে গিয়ে খুব ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল। দু-তিন পেগ পেটে পড়তেই তিনি দেবীপ্রসাদকে ইমপ্রেশনিজ্‌ম্‌ আর সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্‌ এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় আহ্বান ক'রে বসল। দেবীবাবুর অংকনরীতি নিয়েও কিছু উড়ো মন্তব্য করল। দেবীপ্রসাদ গোড়ায় তেমন গ্রাহ্য না করলেও শেষে একটু বিরক্ত হয়ে বললেন--গৌরীশংকরের বন্ধু হিসেবে আপনাকে আমি সমান আসনে বসবার অধিকার দিয়েছি এবং দেবো। কিন্তু আপনি শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তাই শিল্পরীতি বা ভাস্কর্য ইত্যাদি ললিত কলা নিয়ে আলোচনা করার আগে আপনার আঁকা ছবি দেখতে চাই। এরপর যেদিন আসবেন এখানে, নিজের সৃষ্টির কিছু নমুনা সংগে আনবেন। তারপর স্থির করব আপনি কোন্‌ স্ট্যান্ডার্ডের আর্টিস্ট সেই অনুপাতেই আলোচনা হবে।

'পিশাচ'-এর পর 'মাংসলোলুপ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠালেন মদ্রাজ থেকে। 'মাংসলোলুপ' ছাপা হ'ল হাতে-তৈরি কাগজে এবং বড় সাইজে। খুব সুন্দর ছেপেছিল শ্রীগৌরাংগ প্রেস। এ বইতে সাদা-কালোয় আঁকা কয়েকটি উন্মাদনা সঞ্চারী ছবিও ছাপা হয়। তার সংগে একটি ভিখারির কোটরগত চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টির ছবি। ওই সময়ে এক চিঠিতে লিখলেন : 'তিন জায়গায় প্রেমের বাঁধন পড়েছে, ছবি ছাড়ান দিলে মূর্তি চেপে ধরে পরেরটির কবল থেকে রেহাই পেলে লেখা স্কন্ধে ভর করে। গুছুনে লোক হলে এতদিনে তো নিজের পয়সা খরচ করে, ছবির বই, মূর্তির বই ছাপিয়ে ফেলতে পারতাম। এ দিকটা গলদ নিয়েই জন্মেছিলাম, যাবার পথে আর স্বভাব শোধরানো যায় না। (৬.১০.৫০) যতদূর মনে পড়ে তাঁর রঙীন ছবির বই প্রকাশ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব করেছিলাম আগের যে চিঠিতে, তাতে মুদ্রণ ইত্যাদির ব্যয়ভার আংশিকভাবে বহনের কথাও ছিল। তা ছাড়া তাঁর আঁকা ছবি কত এবং কোথায় কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে তার কিছুই তো জানা নেই আমার--সেই প্রসংগেরই জবাব। মাংসলোলুপের সেই ভিখারীর ছবির একটি অয়েল পেন্টিং (মিনিয়েচার) আমাকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি সরাসরি কোনো ছবি না চেয়ে ঘুরিয়ে লিখেছিলাম, বেচারি ভিকিরি দেয়ালে বড়ই নিঃসংগ জীবন যাপন করছে, তার কোনো সঙ্গিনী পাশে থাকলে ভালো লাগতো! তার উত্তরও এই চিঠিতেই দিয়েছেন : 'নতুন একটা ছবি চান? দেখি খুঁজে হাত্‌ড়ে যদি কিছু পাওয়া যায়। উপস্থিত বিরাট মূর্তির কম্‌প্লিকেশনে পড়েছি। কমপ্লিকেশনকে সিম্‌প্লিসিটির প্যাঁচে ফেলতে প্রাণান্ত অবস্থা। যদি সফল হই তো কিছু আনন্দের খোরাক পাওয়া যাবে। ঐটুকুই তো আমার বাঁচার সম্বল, দেশ তো কেবল প্রশংসা করেই প্রাণ জল করে দিল।... (৬.১০.৫০)

এরপর (১০.১০.৫০) তারিখের চিঠিতে জানাচ্ছেন : 'প্রতিশ্রুত ছবি পাঠালাম। মেয়েটি আমার কল্পনাজাত, ফলে একটু গাঁট্টা-গোঁট্টা হয়ে গিয়েছে। আশা করি ব্যবহারে অসুবিধা বোধ করবেন না।...

ওঁর অনুমান মোটেই অমূলক নয়। আমার সামাজিক পরিবেশে শুধু **তো** সাহিত্যিক-শিল্পী-কবি ছাড়া সাধারণ প্রায় অনাধুনিক রুচির মানুষই বেশি। বিশেষ ক'রে বাবার চোখে এই ছবি পড়লে তিনি তখনই ছেলের অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে এ বাসা ছেড়ে রাজাগঞ্জে চলে যাবেন এবং জীবনে আমার মুখদর্শন করবেন না। অতএব সেই আবরণহীনা জ্বালাধরানো যৌবনবতী রমণীটিকে খবরের কাগজে আচ্ছাদিত করে বিছানার তলায় চালান ক'রে দিলাম। অবিশ্যি বাড়িতে আনার আগে ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিয়োর শিল্প-প্রেমিক বন্ধুদের আড্ডায় ছবিটি নিয়ে গিয়েছিলাম। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, ইন্দ্র দুগার তো আসেনই তাছাড়া আরও অনেক রথী-মহারথীকে যে-কোনো সময়ে ওখানে দেখা বিচিত্র নয়। ভারত ফোটোটাইপের অজিতমোহন গুপ্ত পিতার কাছ থেকেই ব্লক ও মুদ্রণের ঐতিহ্য পেয়েছেন। অজিতদা নিজেও শিল্প সমঝদার, সহৃদয় মানুষ। ছবিটি যে দেবীপ্রসাদের আঁকা একথা কাউকে ব'লে দেবার দরকার হ'ল না। সেদিন ওই ছবির সূত্র ধরেই কথায় কথায় যামিনী রায়ের প্রসংগ এসে পড়ল।

দু'জনেই তো প্রায় একই সময়ের মানুষ এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে দু'জনের চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য থেকে এক চুলও নড়তে নারাজ। পাশ্চাত্য ধারায় চরম উৎকর্ষ দেখিয়েও যামিনী রায় ললিত কলার সরল পট-পুতুলের মত লোকশিল্পের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার কঠিন ব্রত নিয়ে রং তুলি ব্যবহার করতে লাগলেন। এর ফলে ভদ্রলোককে চরম অর্থকষ্টে পড়তে হ'ল। কে ওইসব আলপনা, পট-পুতুলের কদর করবে! শিল্পীর ছবি যদি কেউ না কেনে এবং তাঁর রুজি-রোজগারের বিকল্প ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে তো হাঁড়ি চড়াই দায়। যামিনীবাবুর নাকি প্রায় সেই দশাই দাঁড়িয়েছিল। এমন সময়ে বাংলার ছোট লাটের ইংরেজ সেক্রেটারি আরউইন সাহেবের গাড়ি একদিন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের গলিতে ঢুকল। তার আগে কবি বিষ্ণু দে শিল্পী যামিনী রায়ের কলা-শৈলী সম্পর্কে ইংরেজি কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। তারই ফলে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন কিছু কিছু শিল্পরসিক। যামিনী রায়ের দিকে নজর পড়ল। কোন এক উৎসাহী লেখক তাঁর বই-এর প্রচ্ছদচিত্র আঁকানোর উদ্দেশ্যে যামিনীবাবুর কাছে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়েছেন, একথা একদিন তারাশংকরের জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের মুখ থেকে শুনেছি। বই-এর নাম 'রাহু' শুনেই উনি মাথা নেড়ে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বললেন 'ও-বাবা, ও আমি পারব না। 'রাহু' 'শনি' এঁদের কল্পনাতেই আমার তুলি কেঁপে রং জুব্‌ড়ে যা-তা হয়ে যাবে।' অথচ নিজে থেকেই তারাশংকরের 'কবি'

উপন্যাসের প্রচ্ছদচিত্র এঁকে রেখেছিলেন। পাশাপাশি বাড়ি এবং ইনি ওঁর বাড়ি তামাক খেতে আসেন। সেই তাম্রকূট সেবনের কালে তারাশংকরকে সেটি উপহার দেন।

যামিনী রায় থেকে প্রসংগ ঘুরে গেল অবনীন্দ্রনাথ প্রসংগে। দেবীপ্রসাদ প্রথম জীবনে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শেখেন। তারপর অবশ্য হিরন্ময় রায়চৌধুরীর কাছে শারীর সংস্থানের বিশেষজ্ঞতা অর্জন ক'রে ভাস্কর্যের তালিম নেন ইতালীয় ভাস্করের কাছে। তাঁর প্রথম গুরু অবনীন্দ্রনাথ এই শিষ্যের ছবির তারিফ করতেন অকুণ্ঠভাবে। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার আশু বেশ ভালোই জানেন। আশু তো আর্ট কলেজের ছাত্র। একখানি জলরং-এর ছবি এঁকে তাঁর মনে হয়েছে খুব ভালো হয়েছে। যেদিন অবনীন্দ্রনাথকে ছবিটি দেখাবার জন্যে কলেজে নিয়ে গেছেন কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না। নামবার জন্য তিনি যখন সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন তখন ব্যস্ত ভাবে তাঁর পথ আগলে, ছবিটি তাঁর সামনে ধরলেন আশু। অধ্যক্ষ ছবিটি দেখে কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছেন। জননীর ব্যাকুলতা নিয়ে আশু জিজ্ঞাসা করলেন -- 'কেমন দেখলেন ?'

--বেশ হয়েচে।

--আজ্ঞে কিছু ভুলচুক হয়ে থাকলে একটু দেখিয়ে দেবেন না ?

শিল্পগুরু এবার থমকে দাঁড়ালেন। ছবিতে আর একবার নজর দিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন -- হুম্ ব্বাবা, এ যে দেখচি সব্ব অংগে ঘা -- মলম লাগাই কোথা ব্বাবা !

ছাত্রদের মতো নিজের ওপরেও তিনি নির্মমভাবে ছড়ি ঘোরাতেন।

অবনীন্দ্রনাথ একবার একটি বড় ছবি এঁকেছেন। ইজেলে রাখা সেটাই তাঁর তখন অধুনাতম কাজ। বিষয়বস্তু, একপাল গরু নিয়ে রাখাল ছেলে চলেছে। ছবিটি নিজে দেখছেন, যাকে কাছে পাচ্ছেন দেখাচ্ছেন। তারিফ করছে সবাই। পরদিন দেখা গেল ক্যানভাসের ওপর একটি গরু আর সেই রাখাল ছেলে। যে দেখছে অবাক হয়ে সে-ই প্রশ্ন করছে -- 'আর সব গরু কোথায় গেল ?' উনিও মুচকি হেসে মজা ক'রে জবাব দিচ্ছেন -- 'হুম্ ব্বাবা সব চরতে গ্যাচে।' আসল কথা, নিজের কাজও তিনি খুঁটিয়ে বিচার করতেন।

দেবীপ্রসাদের উপহৃত সেই উদ্ভিন্ন-যৌবনাকে বন্ধুদের নজর থেকে উদ্ধার ক'রে বিছানার তলায় রাখার পর, একদিন শ্রীমান রঘুনাথ গোস্বামীকে কথায় কথায় বলেছিলাম। রঘু সুরূপার মাসতুতো ভাই এবং ছবি-টবি আঁকে এই সুবাদেই তার ছোট মামা অর্থাৎ আমার ছোট মামাশ্বশুর তাকে দোকানে এসে সবার সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটমামার উদ্দেশ্য রঘুকে কিছু ছবি আঁকার কাজ পাইয়ে দেওয়া। রঘুনাথ নিজেই তো ওরিয়েন্টাল আর্টের নমুনা। টানা টানা স্বপ্নভাসা চোখের 'teen-ager' এই লাজুক ও মিষ্টভাষী ছেলেটির হাতের কাজও একটু অন্য ধাঁচের। রঘুকে কিছু কিছু কাজ দিই আমরা। তখন মাখন দত্তগুপ্ত, আশু বন্দ্যো এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর কাজ আধুনিক রুচির প্রকাশকদের আদর পাচ্ছে। সত্যজিৎ সিগনেট ছাড়া অন্যের কাজ করেন না। ওসব কথা থাক। রঘু একদিন অন্নদা মুন্সীকে নিয়ে হঠাৎ বলা কওয়া নেই ঢাকুরিয়ায় হাজির দেবীপ্রসাদের ছবি দেখতে।

রঘু আর মুন্সীদার একটা ফোটো তুলেছিলাম। উনি তখন শার্ট আর মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরতেন। ছবিকে ওইভাবে গোপনে রাখতে দেখে উনি উচ্চকণ্ঠে হেসে বলেছিলেন গৌরীদা কেমন ভীতু দেখিচিস !

ভীতু কিনা জানি না। তবে তাঁর কথাটা একেবারে উড়িয়েই বা দিই কি করে! পটে আঁকা ছবি ছাড়িয়ে, এই বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে নিজের জীবনযাত্রাকে খতিয়ে দেখলে কি পাই ?

বলুদা'র সংগে আমার যতই ঘনিষ্ঠতা থাক না কেন, বিধাতার সৃষ্টি বৈগুণ্যে বৌদির সংগে সম্পর্ক কোন কোন ক্ষেত্রে যেন গভীরতর এবং ঘনিষ্ঠতর। এক-এক সময়ে সান্নিধ্য এতই নিবিড় হয়ে পড়ে যে নিজেকে চুলমাত্র তফাতে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রয়েড, ইয়ুংগ বা বাৎস্যায়নের খতিয়ান এই ধরণের সম্পর্কের একটিই সম্ভাব্য পরিণতি নির্দেশিত। তৎসত্ত্বেও সত্যি কথা বলতে পারি -- গন্ডীকে অতিক্রম করা যায় নি। হয় তো সেটা উভয়েরই ভীরুতার পরিচয়, হয়ত বা তা নয়

দু'জনেরই স্ব স্ব সামাজিক দায়িত্বের প্রতি আনুগত্য (তা সে স্বেচ্ছায়ই হোক বা বিচারবিবেচনা প্রসূতই হোক) পরোক্ষভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। টানা-পোড়েনে বহুবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ভরসার ভিতটা ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছিল এটা টের পেয়েছি। তাই বলুদা যখন সিন্দ্রানীতে কয়লার কারবারে নামলেন এবং কিছুদিন পরে সেখান থেকে বৌদি নিজের অসুস্থ সংবাদ এবং বলুদাও ওখানে নেই একথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। তবু তাঁকে দেখতে যাবার ইচ্ছা দমন করতে হল। তাছাড়া গীতা প্রকাশের ব্যাপারে বলুদার ছেলেমানুষীও আমাকে কিছুটা খেলো করেছে। নিজেরও কাজের চাপ বেড়েছে। আর জড়াতে চাই না। মাসখানেকের মাথায় জানতে পারলাম, বৌদি পুরী চলে গেছেন এবং বলুদা নিরুদ্দেশ। কর্তব্যবোধে তাঁর ফোটো দিয়ে 'নিরুদ্দেশের' স্তম্ভে বিজ্ঞাপন ছেপে ভীমরুলের চাকে ঢিল মারা হয়ে গেল। হরদম লোক আর চিঠি আসতে লাগল, যেন আমিই তাঁকে লুকিয়ে রেখেছি। হাওড়ার কালেন প্লেস থেকে দূত এল: ত্রিবেণী দিদি বড়ই চিন্তিত বড়দার খবরের জন্য, বাবাও এখানে আছেন। একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। ত্রিবেণীদি রাধাকিষণ চামারিয়ার কন্যা। ওঁরা সবাই গুরুদেবকে 'বাবা' বলেন।

রাধাকিষণ চামারিয়ার বাড়ি তো নয় বিরাট প্রাসাদ। একতলার চার প্রান্ত দু-বার চক্কর দিলেই এই গরমে ঘাম ঝরবে। দোতলায় যে ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়ির চৌহদ্দি বোধহয় এর অর্ধেক। ঘরের মাঝখানে ধবধবে সাদা গদির ওপর সান্যাল মশাই বসে কথা বলছিলেন। প্রণাম করতে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন -- 'ইন্দুভূষণ ভালো আছেন তো ?' তারপর দু'চার কথার পর ত্রিবেণীদি আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। বলুদার মা এবং এই ভদ্রমহিলার উদ্বেগ উদ্বেল প্রশ্নের জবাবে আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আমার উপায়ান্তর নেই। শুধু বললাম -- 'এবার বাংলা কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখি। আর আপনারাও চেনাজানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখুন ওঁরা বললেন কনখল থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত সর্বত্রই চিঠি লেখা হয়েছে অতঃপর জলযোগের জন্য পীড়াপীড়ি। বললাম সারাদিনের গ্লানি নিয়ে কিছু মুখে দিতে পারব না। বাড়ি গিয়ে আগে স্নান করতে হবে।

সব সময়ে উপস্থিত থাকলেও এতক্ষণের মধ্যে বৌদি একটি কথাও বলেন নি এবার মুখ খুললেন --স্নান এখানেও করা যায়।

বাথরুম তো নয় হল ঘর বিশেষ : বাথটব, শাওয়ার ইত্যাদি সুসজ্জিত। বৌদি ধুতি, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি সব কিছুই একে-একে যথাস্থানে রেখে গেলেন।

জলযোগের বর্ণনা বাহুল্য। যেটা লক্ষণীয়, বৌদি সবই করছেন কিন্তু প্রশ্নের জবাব ছাড়া নিজে থেকে কোন কথা বলছেন না।

অবকাশ মত বললাম এত অবজ্ঞাও মানুষকে করা যায় !

তীক্ষ্ণ জবাব যায় !

হাল্কা ভাবেই প্রশ্ন করি -- কেমন ক'রে ?

একেবারে নীরব থেকে। চিঠি দিলেও তো তার উত্তর না দিয়ে।

অতঃপর আমার দশা যা হ'ল তা ভাষায় বর্ণনা করার চেয়ে পাঠকের

কল্পনার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

এরপর সংক্ষেপে বলি। দিন কয়েক পরে বৌদির বাবার অসুখের খবর পেয়ে বলুদা তাঁকে নিয়ে ঢাকায় গেলেন। ওঁরা মাসখানেক সেখানে কাটাবেন। তাঁর আকস্মিক ভাবে ফেরা এবং ঢাকায় বৌদিকে নিয়ে যাওয়াতে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কিন্তু তাঁর সংগে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এবং বৌদি নাকি আর কোনদিন ঘর করতে আসবেন না। ঘটনা বা অঘটন যা-ই বলা যাক না কেন -- আরও কিছু বাকি ছিল। মাস কয়েক পরে বলুদা কোথা থেকে খবর পেলেন তাঁর পত্নী কলকাতায় এসেছেন। তারপর ছট্‌ফটানি শুরু হ'ল, - ফিরিয়ে আনার জন্য। গোয়েন্দা বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেল প্রচেষ্টা। নিজেকে যথাসাধ্য তফাতে রেখেই চলছিলাম। কিন্তু একদিন রাত ন'টা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সংগে ঢাকুরিয়ায় এসে জানালেন -- কপট কৌশলে বৌদিকে লালবাজারের information office-এ নিয়ে গিয়ে একটু শাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে আত্মীয়ের আশ্রয়ে তাঁদের পরিবার বাস করছেন, দরকার হ'লে তাঁকে দুর্নীতির দায়ে ইত্যাদি প্রভৃতি। ভালোয় ভালোয় শ্বশুরালয়ে ফিরলে অবশ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তাঁদের কথাতেই জানলাম একেবারে গংগার ধারে সেই বাড়ি। সংগে সংগে সুরূপা ও আমি দুজনেই সম্ভাব্য পরিণতির কল্পনায় আঁতকে উঠলাম। ধৈর্য ও আত্মমর্যাদাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে তাতে আত্মহত্যার সম্ভাবনাই বেশি। কি করি ? সুরূপার কোলে কচি বাচ্চা, আমিও একা যেতে ভরসা পাচ্ছি না। অথচ আজ রাতের মধ্যেই কিছু ঘটে যেতে পারে। বলুদাকে হঠকারিতার জন্য ধিক্কার দিয়ে দায়িত্ব ফুরোয় না। পরিস্থিতির গুরুত্ব মগজে ঢুকতেই তিনি কেঁদে ফেললেন। আলোচনা পর্যালোচনা রাতের পাট চুকিয়ে আমাদের বেরুতেই বেশ রাত হয়ে গেল। পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার এইরকম কয়েকটা জায়গায় রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ। তার মধ্যে দিয়ে বরানগরের নিষুতি পথে ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা স্বামী-স্ত্রী এবং কোলের সন্তানকে নিয়ে। বলুদা বললেন, ঘাটের ধারে অপেক্ষা করবেন প্রয়োজন হ'লে যেন ডাকা হয়।

মোটা-মোটা উঁচু থামওয়ালা প্রায়-অন্ধকার দালানেই বৌদি ছিলেন। আমাদের দেখে শ্লেষ আর তিক্ত কথার তীর তাঁর কণ্ঠচ্যুত হ'ল -- 'কী, নাটকের শেষ দৃশ্য দেখতে এলেন বুঝি ?'

যখন তিনি বুঝলেন সত্যিই আমরা তাঁর সমব্যথী এবং পাছে তিনি বীতরাগবশতঃ আত্মঘাতের চেষ্টা করেন এই ভেবেই আটকাতে এসেছি তখন একটু একটু ক'রে কপাট খুলতে লাগলেন। বললেন, নাটকীয়তা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। বড্ড মশার উৎপাত ব'লে পাখা চালাতে লাগলেন - বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই আছে বিরাট ঘর। বিছানা ক'রে দিয়ে বললেন আপনি শুয়ে পড়ুন নিশ্চিন্ত মনে। আমরা দুজনে একটু গল্প করি। ঘুম তো হবে না!

ঘুম আমারও হ'ল না। শুধু মুহূর্ত পার ক'রে যাওয়া।

তিনি বললেন -- শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবো। সবাইকেই ভালবাসি। কিন্তু এক বছরের মধ্যে ওর মুখ দেখবো না। এই প্রতিশ্রুতি চাই। বাবার কাছে আমি এটাই চাইব। ব্যস্‌, আর কিছু নয়।

পরদিন ভোরবেলায় কতকটা হাল্কা মনেই ফিরলাম।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু দিন বাদেই বলুদা ভাঙলেন। শুধু তাই নয়, শুনেছি দেওয়ালে মাথা ঠুকে 'সিন' ক্রিয়েট করেছিলেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই অধ্যায়ের কোথাও কোথাও বেশি রঙের ছোপ-ধরা প্রতিভাত হ'তে পারে। কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে কলমকে খুব সংযতই করে রাখা হয়েছে।

উপসংহারটা মোটেই সংহারমূলক হয় নি। যদিচ অগ্নিসম্ভব সম্পর্কে তিনি বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন অতীতে -- নতুনভাবে নিজের জীবনের পথ বাছাই-এর বেলায় রমিতার মতোই প্রাইভেট স্কুল ফাইন্যাল পাস করে নার্সিং কোর্সে ভর্তি হলেন। আমাদের সংগে কোনো যোগাযোগই ছিল না তাঁর। না থাক, আমার সান্ত্বনা এই যে, আমার সাহিত্য কিছু নির্দেশ দিয়েছে তাঁকে। কোনো এক আত্মীয়া নার্সিং পড়ছিল। কলকাতায় আমি তার অভিভাবক। সেই সূত্রে হস্টেলে তার সংগে দেখা করতে যাই মাঝে মাঝে। হঠাৎ একদিন ভিজিটার্স রুমে সিঁদুর মোছা যে তরুণীকে দেখে রক্তের তাপে মুখে-কানে জ্বলুনি অনুভব করলাম, তিনি --!

কোনো বাক্যব্যয় নয়, দৃষ্টি বিনিময়ও যেন হ'ল না। পরে সেই মেয়েটি আমাদের পুরনো সম্বন্ধের কথা তুলে কিছু বলেছিল। জবাবে উনি বলেছিলেন -- 'বুকের যে দিকটা এ. পি. করা হয়ে গেছে তা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে কি হবে!'

আমার পরিচিতদের মধ্যে দুটি চরিত্রকে দেখেছি 'come whatever may!' ব'লে প্রবল প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ বুক পেতে নিতে।

একজন হলেন গিরীন। বিব্‌লিওথেক থেকেও বিনিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি বি.টি পরীক্ষা দিয়ে পরে পার্ক সার্কাসের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে ঋজু মেরুদন্ড নিয়ে ভাগ্যের সংগে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন। অপর জন বৌদি। গিরীনের চেয়েও তাঁকে প্রবলতর প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। বছর দশ মাঝে-মাঝে খবর পেয়েছি তিনি অমুক হাসপাতালে পোস্টেড। বদলির খবরও কানে এসেছে। হঠাৎ কোন দিন কলকাতার পথে কাউকে দেখে মনে হয়েছে সেই চেনা মুখটি। না ভুল নয়। কিন্তু কাছে যাই নি। কি হবে নিষ্ফল আলোড়নে অস্থির হয়ে বা করে! সময়কে সংগী করে দূরের সেই দিনকে কোন উপন্যাসের অধ্যায় হিসেবে গ্রহণই শ্রেয়। বছর দশ-পনের আগে হঠাৎ আমার কাছে এক ভদ্রলোক দোকানে এসে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বৌদি তাঁকে পাঠিয়েছেন বলুদার ঠিকানার জন্য। তিনি কোথায়? কফি হাউসে অপেক্ষা করছেন। কি ব্যাপার, হঠাৎ এতকাল পরে ঠিকানার প্রয়োজন হ'ল? তিনি বিয়ে করে নতুন সংসার পাততে চান। ঠিকানা জানি না তবে এটুকু জানা আছে যে, natural dissolution of marriage হয়েই গেছে, অতএব ওটা কোন বাধাই নয়। তারপর তিনি কি করেছেন জানি না।

দেবীপ্রসাদের দেওয়া সেই যুবতীর লাইন স্কেচটি আরও কয়েকজন শিল্পরসিক দেখেছেন। প্রতিবারই ওই গুপ্ত স্থান থেকে তাকে প্রকাশ্যে এনে আবার অন্ধকার হারেমে পাঠিয়ে দিয়েছি। বেচারি একদিন এইভাবেই অভিশপ্ত দশা নিয়ে ছিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে যেমন হয়েছে আমার সাধের সেতারটি। অবশ্য বীণার মায়ের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেতারের যশটা চূর্ণ হয়েছিল কিন্তু চতুরালির শিরোমণি ভাষ্য করল : টেরেনের কাঁপুনি লেগে ঝুলানোর পচা দড়িটা ছিঁড়ে পড়ে গেল, ঘর মুছ্‌তি মুছ্‌তি চখির সামনে দেখনু গো বৌদিদি। □

আসানসোল গার্লস কলেজ অধ্যক্ষা

রেবা ঘোষের প্রাণনাশের চেষ্টা পুলিস অভিযুক্তদের ধরেনি

গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা রেবা ঘোষের চোখে ব্যান্ডেজ

আটাশে জুন , রাত দশটা হবে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডের. বিরাট মাঠ কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল। হাউসিং এস্টেট থেকে ফিরছিলেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ রেবা ঘোষ। দ্রুতই পা চালাচ্ছিলেন। অন্ধকার জনমানবহীন রাস্তায় কোয়াটার্সে ফিরতে যে বুক কাঁপছিল না তা নয়। মিনিট দুয়েক আসার পরই পি ডব্লিউ ডি অফিস। হঠাৎ অনুভব করলেন, কাঁধে কারোর হাত। চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই "দেখলাম, শ্যামল। দেখলাম ও গলা টিপে ধরতে আসছে।" শ্যামল মানে শ্যামল মুখার্জি। গার্লস কলেজেরই কর্মী, সি পি এম সমর্থক। শুধু শ্যামল নয়, সংগে ছিল আর এক ব্যক্তি। তাকে চিনতে পারেন নি ডাঃ ঘোষ। শিরদাঁড়া বেয়ে হিমশীতল একটা অনুভূতি নেমে গেলেও ইনস্টিংক্টটা কাজ ঠিকই করছিলো। ছুটতে শুরু করলেন। পারলেন না। তার আগেই "ওরা দুজন ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলো।" তারপর? সে-রাতের অভিজ্ঞতা বলতে বলতে কথা আটকে যাচ্ছিল। কেবলই গুরুর ছবি মাথায় ঠেকাচ্ছিলেন। আততায়ীদের একজন ওঁর বুকে চেপে বসে ডান চোখে ক্রমাগত ঘুসি মারতে থাকে। চিৎকার করেও কোন লাভ হয় নি। তবে "ঈশ্বরের কৃপায়, সে সময় একটা গাড়ি এসে পড়ে। শ্যামল মুখার্জী পালায়। গাড়িটা থেমে পড়তেই অপরজনও পালায়।"

প্রশাসনের বাঘা বাঘা কর্মকর্তাদের সিদ্ধার্থ রায় (এ এস পি) আশিস বহুগুণা (এ ডি এম), সুবেশকুমার দাস (এস ডি ও) বাড়ির মাত্র দু থেকে তিন শত গজ দূরে লাঞ্ছিত হয়ে গেলেন এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ঘটনার পর অর্ধচেতন অবস্থাতেই কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে এ এস পি সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে উপস্থিত হন ডাঃ রেবা ঘোষ। হীরাপুর থানার ও সি উমাশংকর মুখার্জীকে তলব করেন এ এস পি।

ডঃ রেবা ঘোষ লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁর আক্রমণকারীদের একজন তাঁরই কলেজের কর্মী। নাম শ্যামল মুখার্জী। কোন লাভ হয় নি। প্রশাসনের বিরুদ্ধে এরপর থেকে যে অভিযোগ উঠে আসছে, তা হলোঃ শুধুমাত্র সি পি এম কর্মী বলেই কি শ্যামল মুখার্জী আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যাচ্ছে? উত্তর পাওয়া যায় নি। পুলিস অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছে। গ্রেফতার নাকি করা হবেই। এদিকে হত্যা চেষ্টার বদলে "শাসক দলের চাপে পড়ে" শ্যামল মুখার্জীকে জামিনযোগ্য সামান্য অপরাধে অভিযুক্ত করেছে পুলিস।

ডঃ রেবা ঘোষ গার্লস কলেজে যোগ দেন প্রায় বছর দেড়েক আগে। অল্পদিন পরেই শুরু হয় পরিচালন সমিতির সংগে ঠান্ডা, পরে তপ্ত লড়াই। দানা পাকাতে থাকে উত্তেজনা। পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন সি পি এম বিধায়ক বিজয় পাল। তিনি যাওয়ার পর নতুন সভাপতি হলেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম রায়চৌধুরী। সি পি এম-এর আর এক নেতা। সভাপতি বদল হলেও অবস্থা বদলায়নি। বরং অবনতি ঘটতে থাকলো পরিস্থিতির। কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকারাও স্পষ্টতই দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। বর্ধমান জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হল।

যখন কলেজে আসেন ডঃ ঘোষ তখন অধ্যক্ষার কোয়াটার্সে থাকতেন অধ্যাপিকা বীণা দাশগুপ্তা, মন্দালিকা চক্রবর্তী ও শ্যামলী দে (বর্তমানে সরকার)। অধ্যক্ষা কারোর সংগে থাকতে রাজী না হওয়ায় প্রথমেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যাইহোক পরে অপর তিন অধ্যাপিকা অন্যত্র চলে যান। এরপর অধ্যক্ষা নথিপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেন বীণা দাশগুপ্তার অবসর গ্রহণের পর যে পুনর্নিয়োগ হয়েছে তা "মহাকরণের নির্দেশ না মেনেই"। তাঁর বেতন দেওয়া হয়েছে হস্টেল তহবিল থেকে। তিনি বীণা দাশগুপ্তের মাইনে আটকে দেন। পরিচালন সমিতি এবং টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অনাদি কুণ্ডু সমেত বেশ কিছু অধ্যাপক অধ্যাপিকা বীণা দাশগুপ্তের হয়ে সওয়াল করলেও ডঃ রেবা ঘোষ তাঁদের কথা শোনেন না।

দু বছরের মেয়াদ শেষ করার পর আবার কার্যকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হল। ডঃ ঘোষ

রেবা ঘোষের কোয়ার্টার। কোন নিরাপত্তা নেই।

বেঁকে বসলেন। ইতিমধ্যে জল অনেক ঘোলা হয়েছে। কলেজে সক্রিয় আন্দোলনও শুরু হয়ে গেছে। ডঃ ঘোষের অভিযোগ, তাঁকে ন্যূনতম সম্মানটুকু না দিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেকে সি পি এম সংসদ সদস্য সুধীর রায় স্বয়ং বীণা দাশগুপ্তের পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত ফর্মে "সই করতে বলেন।" তিনি রাজী হন নি। সি পি এম মহল থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, অধ্যক্ষা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সি পি এমের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছেন।

ডঃ রেবা ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি কলেজের রীতিনীতি না মেনে চলছেন, পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকছেন না এবং অধ্যাপিকা বীণা দাশগুপ্তর পুনর্নিয়োগে বাধা দিচ্ছেন। অধ্যক্ষার পাল্টা অভিযোগ তাঁকে সরানোর চেষ্টা চলছে। সমিতির বৈঠক ডাকার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন। তবুও অবস্থা ঘোরালো হয়েছে দিনের পর দিন। পরিণতি আটাশে জুনের ঘটনা।

দীর্ঘদিন ধরে ডাঃ ঘোষ বিপন্ন বোধ করছিলেন। কলেজের একপাশে তাঁর কোয়ার্টার্স, শহরের এক কোণে কলেজ। সন্ধ্যের পর ঝিঁঝিঁর ডাকে নিস্তব্ধতা বাড়ে বৈ কমে না। পূর্বদিক দিয়ে গেছে রেল লাইন।

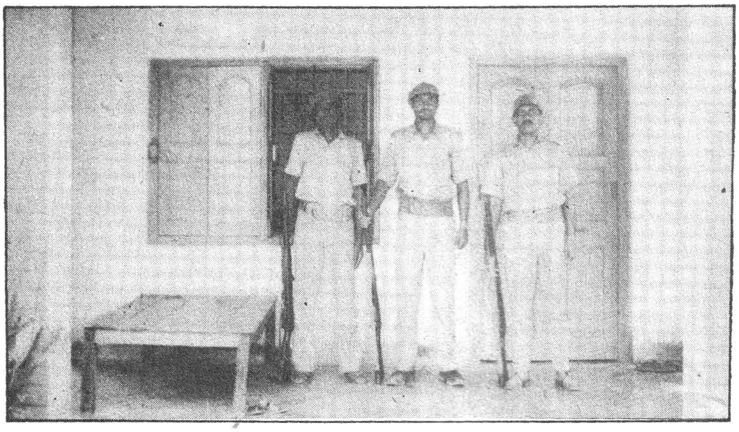

অধ্যক্ষার বাড়িতে পুলিস প্রহরা

"পাঁচিল ডিঙিয়ে সন্ধ্যার পর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আনাগোনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সমস্তই প্রশাসনকে জানিয়েছেন ডঃ ঘোষ। তবু শেষরক্ষা হয় নি। আহত হবার পর কোয়ার্টার্সের বাইরে সশস্ত্র পাহারা বসেছে। সন্ধ্যার পর থেকে কাউকে হুট করে দেখাও করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এ ঘটনা ঘটার পর শহরের বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একবাক্যে অধ্যক্ষা আক্রান্তের ঘটনাকে নিন্দা করেছেন সি পি এম এবং কংগ্রেস। ফায়দা লুটতে তৎপর কংগ্রেস বিক্ষোভ, সেইসঙ্গে আততায়ীদের গ্রেফতারের দাবি। কিন্তু যে ঘটনা ঘটে গেছে তারপরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নি।

সি পি এম কলেজের বর্তমান অবস্থার জন্য অধ্যক্ষাকেই দায়ী করেছে, অধ্যক্ষা সি পি এমের বিরুদ্ধে অভিযোগে অনড়। অন্তিম পরিণতি কি হবে তাই নিয়েই আজ শহরের বুদ্ধিজীবী এবং নাগরিকরা রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ◻ ছবি : অলোককুমার মিত্র

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

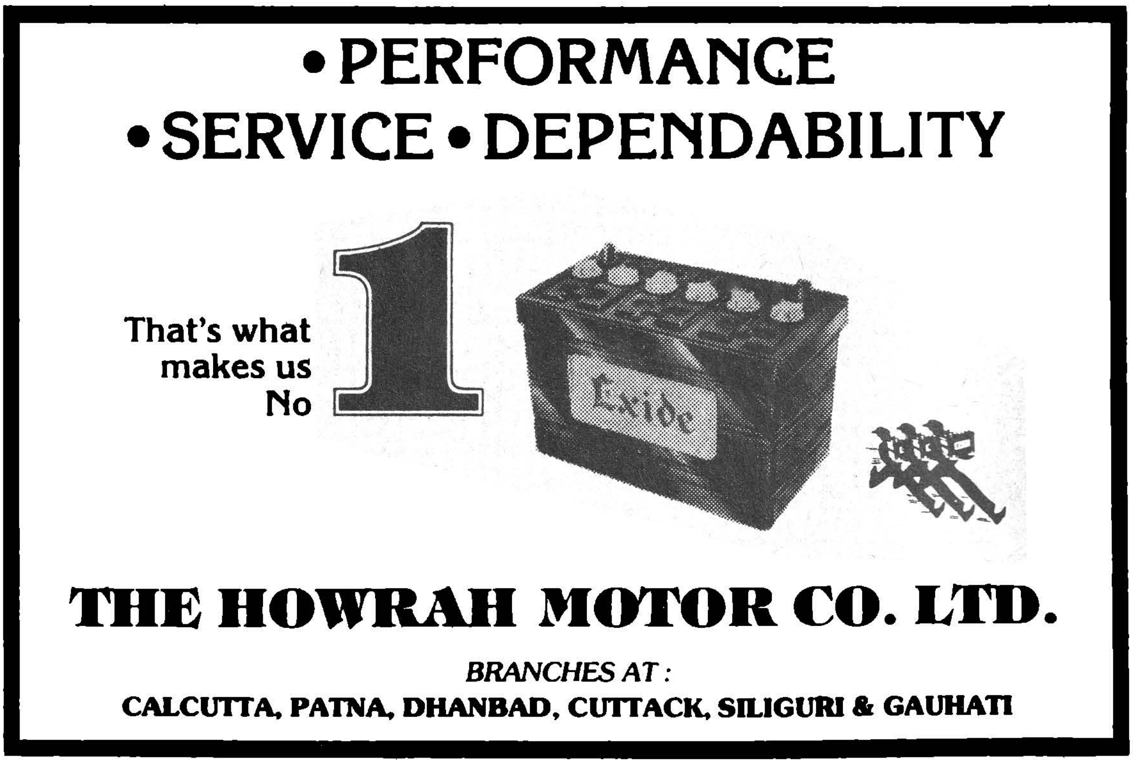

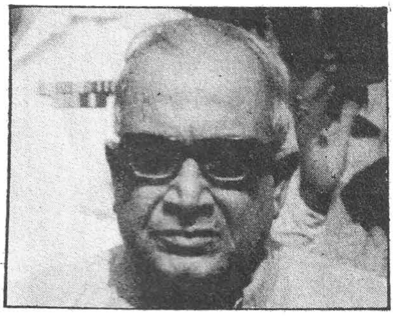

যতীনবাবুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মাঝে-মধ্যেই খবর হয়ে ওঠেন। নানারকম মজার কান্ড তিনি নিজেই ঘটান বা তাঁকে ঘিরেই গড়ে ওঠে রকমারি কান্ড-কারখানা। এ রকমই একটা ঘটেছিল কিছুদিন আগে।

রথের দিন। ফোর্ট উইলিয়ম সেনানিবাসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণজীউ-এর মন্দির উদ্বোধন হবে। গণ্যমান্য মানীগুণী অনেকেই এসেছেন। এসেছেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য। নিমন্ত্রিত পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীও। বামফ্রন্ট শরিক বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টির সভ্য তিনি। যে পার্টি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করবে বলে ঘোষণা করে। মার্কস-লেনিনের কথায় ওঠে-বসে। এ হেন দলের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এলেন মন্দির বিগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে। মন্ত্রী যখন তখন অনেক কিছুই করতে হয়। উপায় নেই সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে খর্বাকৃতি মন্ত্রীবর যখন সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন শঙ্করাচার্যের পায়ে তখন উপস্থিত অনেকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। উনি শুধু শুয়েই উঠে পড়েননি। একটানা অনেকক্ষণ পা জড়িয়ে শুয়েছিলেন। বলে উঠলেন, বাবা আমায় বাঁচাও।

জগদ্গুরু কি বলেছিলেন শোনা যায়নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লম্বা হয়ে উঠে পড়েন মন্ত্রী। জামার আস্তিন গুটিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করলেন।

মমতা বনাম প্রিয়রঞ্জন

কংগ্রেস এম পি মমতা ব্যানার্জি দিল্লিতে এখন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর প্রতিযোগী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। প্রিয় যেখানে গিয়ে দরবার করছেন মমতা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে গিয়ে হাজির হচ্ছেন। লোকসভায় মমতা এখন প্রিয়রঞ্জনের ঠিক পেছনের বেঞ্চে বসেন। কোন বিষয় নিয়ে প্রিয় বলতে উঠলেই মমতাও সংগে সংগে উঠে বলতে শুরু করেন। অনেক রাজ্যের এম পিদের কাছে মমতা বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সেন্ট্রাল হলে মমতা প্রত্যেকের সংগে কথা বলেন। যাঁর খাওয়া হয়নি, তাঁর জন্য খাবার আনিয়ে দিচ্ছেন। কেউ হয়ত কফি খুঁজছেন, মমতা বলে বলে তাঁকে কফি আনিয়ে দেন। কার খাওয়া হল, হল না সবদিকে তাঁর নজর।

এ আই সি সির শতবার্ষিকী উৎসবে অনেকেই নানারকম নিজ নিজ রাজ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে দেখানোর চেষ্টা করলেন। প্রিয়রঞ্জনও মঞ্চে উঠে একটা বাংলা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনালেন। দূর থেকে দেখতে পেয়ে মমতা দৌড়ে মঞ্চে উঠে সেই গানের কলি ভেঙে দিলেন। প্রিয় আবার অন্য একটা গান ধরলেন। মমতা ঐ গানের একটি মাত্র কলি জানে। ফলে ঘুরে ফিরে যখনই ঐ গানের কলি আসে, মমতা তখন সেইসময় গলা মিলিয়ে দেয়। প্রিয় ভাবলেন, এ তো মহাবিপদ। একেবারে আঠার মত লেগে রয়েছে।

কলকাতায় ফিরে খুব দুঃখ করে প্রিয় আর একজন তরুণ নেতাকে বলছিলেন, বলুন তো, আমি কী করলে মমতা তা করবে না। সেই নেতা উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি যদি দাড়ি কামাও, তাহলে মমতা দাড়ি কামাবে না। নইলে আর সব করবে।

*

সিদ্ধার্থশংকর রায়কে আবার কংগ্রেস রাজনীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন কে? এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। নানাধরণের কথা শোনা যায়। এর মধ্যে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর নামও উঠেছে।

কিছুদিন আগেই প্রিয়রঞ্জন দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে গিয়েছিলেন। ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, দুর্গাপুর কলেজে পুলিসের গুলিচালনায় ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে তাতে সওয়াল করার জন্য আইনজীবী হিসাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কে নিয়ে আসবেন।

এর পরেই সিদ্ধার্থবাবুর সংগে তাঁর দিল্লিতে কথাবার্তা হয়। অনেকের অনুমান সিদ্ধার্থবাবু আবার রাজনীতিতে ফিরে আসছেন। অপর এক পক্ষ অশোক সেনের ফ্ল্যাটে সিদ্ধার্থশংকরের ঘনঘন যাতায়াতের উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে মানুবাবু

অন্তরালে

অশোক সেনের কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে জেলে পাঠাতেও চেষ্টা করেছিলেন। "বসুমতী" হাতছাড়া হয়েছে মানুর জন্যই। অশোক সেনের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটান সিদ্ধার্থের এক মহান কীর্তি। অশোক সেনের মামলার সিংহভাগ এখন তাঁর হাতে। সিদ্ধার্থের অভ্যুত্থানে অশোক সেনের লম্বা হাতও নাকি কাজ করছে।

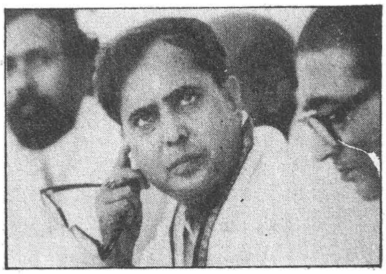

প্রণবান্দজি

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জিকে নিয়ে মাঝে মধ্যেই গুজব রটে যায়। মন্ত্রিসভা থেকে বাদ যাওয়ার পর তাঁকে ঘিরে নানাধরণের সন্দেহ ছড়াতে থাকে। যদিও কোনটিই এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে প্রচারের শুরুতেই প্রণববাবু হঠাৎ কলকাতা ছাড়লেন। শোনা গেল, উনি নাকি ওড়িশায় গিয়েছেন। নানারকম প্রশ্ন উঠল। হঠাৎ কেন উড়িষ্যা গেলেন? কেউ কেউ বললেন, কংগ্রেসের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ওখানে গোপন সভা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের আর একজন নেতা বরকত গণিখান চৌধুরীও নাকি গিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বরকত সাহেব দিল্লিতেই আছেন। আর প্রণববাবু গিয়েছেন গোপালপুর অন সী-তে। কেবলমাত্র বেড়াবার জন্য। ওঁর মেয়ে তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। তাঁকে সংগ দেওয়ার জন্যই গেছেন। যদিও ওখানে গিয়ে রাধাচন্দ্র রথ একটা সেমিনারে ডেকেছিলেন। প্রণববাবু ওখানে গিয়ে ভাষণও দিয়ে এসেছেন।

কলকাতায় ফিরে আবার গেলেন মদ্রাজে। জানা গেল, তিরুপতি মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিতে গিয়েছেন। দেবতা আর জ্যোতিষীর ওপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর। বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। কোন সাধু-সংগ ইদানিং বাদ দিচ্ছেন না। সময় বিশেষ ভাল নয় বোধহয়! □

উৎকোচ সংহিতা ঃ তত্ত্বজ্ঞান

নারায়ণ দাশশর্মা

।। ১ ।।

গত সপ্তাহের চিঠিতে উৎকোচ সংহিতার ভূমিকায় ঘুসের ইতিহাস ও ভূগোল আলোচনা করা হয়েছে। সত্যযুগ থেকে ইতিহাস ও অলিম্পাস পর্বতের চূড়া থেকে ভূগোল। কিন্তু যদিও প্রসংগটি উত্থাপনের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল ঘুসের দুয়ারে দ্বিগুণ লক্ষ্মী বাঁধা থাকার সত্যাসত্য নির্ণয় এবং যদিও এ-সম্পর্কে সংস্কৃত অপদেশের বার্হস্পত্যটি মেনে নিতে আমি অস্বীকার করেছি, তবু ঘুস ও লক্ষ্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আমার অভিমত উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। প্রকৃত তথ্য এই যে লক্ষ্মীলাভের প্রশস্ততম উপায় যে ঘুস -- গ্রহণ এবং দান উভয় পথেই, taker and giver উভয়ের ক্ষেত্রেই, লক্ষ্মীদেবীর বরমুদ্রা যে ঘুসের প্রতি বদান্যতম -- এ বিষয়ে আমার কোন দ্বিমত নেই। বস্তুতঃ এককালে পেঁচা অর্থাৎ উলুক লক্ষ্মীদেবীর বাহন ছিল একথা যদিবা সত্য হয়, এখন আর তিনি উলুকবাহিনী এমনকি উৎক্রোশ (ঈগল)-বাহিনীও নন -- দেবী কমলা এখন উৎকোচ-বাহিনী। উৎকোচোয়ান তার গাড়ি হাঁকিয়ে যেখানে নিয়ে যায় চঞ্চলা লক্ষ্মী এযুগে সেখানেই অচঞ্চলা। ঘুসের লক্ষ্মীমত্তার বিরুদ্ধে নয়, আমার প্রতিবাদ ছিল ঘুসকে পৃথক একটি বৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে।

আকথা-কুকথার মালাকার বৃহস্পতি ভেবেছেন, বাণিজ্যাদি চতুর্বৃত্তির বাইরে ঘুস বুঝি পঞ্চম কোন বৃত্তি, লক্ষ্মী যাতে দ্বিগুণিতা। এইখানেই বুধশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি ভুল করেছেন। ঘুস একটি পৃথক বৃত্তি নয়, বাণিজ্যাদি চতুর্বৃত্তির প্রত্যেকেরই সম্যক্ স্ফূর্তির জন্য ঘুস হচ্ছে অপরিহার্য, অনস্বীকার্য, অবিচ্ছেদ্য অংগ।

আয়ুর্বেদে যেমন মকরধ্বজাদি যোগবাহী ঔষধ অনুপান ভেদে সর্বরোগে প্রয়োগ করা যায়, ঘুস হচ্ছে তেমনি যোগবাহী ঔষধ; বাণিজ্য কৃষি রাজসেবা এমনকি ভিক্ষাবৃত্তিতে পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্ময়কর ফলপ্রসূ। ঘুসের সংযোগ ছাড়া কোনো বৃত্তিতেই পূর্ণ সাফল্য অসম্ভব।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র তিনের মধ্য দিয়েই যেমন এক ও অভিন্ন আদ্যাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ তিন কর্ম সম্পাদন করছেন, কর্মভেদে সেই শক্তিকে কখনো বলি ব্রহ্মাণী, *কখনো বৈষ্ণবী, কখনো রুদ্রাণী, তেমনি একই* আদি ও অকৃত্রিম ঘুস কি বাণিজ্যে, কি রাজসেবায়, কি অন্যান্য বৃত্তিতে, বিভিন্ন নামে কাজ করে যাচ্ছে। কখনও তার নাম ভেট বা উপঢৌকন, কখনো দস্তুরি বা custom, কখনো speed money, কখনো grease money, কখনো silver tonic, কখনো বকশিস, tips বা পারিতোষিক। শুনেছি কৃষ্ণের মাত্র অষ্টোত্তর শত নাম; ঘুসের নাম বোধহয় শতোত্তর অষ্ট সহস্র। কিন্তু কি জানি কেন, ঘুসকে সোজাসুজি ঘুস বলে চাইবার রীতি নেই ঘুসের বাজারে। ঘুস সর্বদাই অন্য কেউ নিয়েছে বা চেয়েছে, আমি যা নিয়েছি তার অন্য নাম। দস্তুরি বা বন্দোবস্ত বা 'নজ্‌কি' বা settlement। সাদামাটা 'টাকা' শব্দও চলতে পারে কিন্তু 'ঘুস' শব্দটা গ্রহীতার কাছে ভীষণ রকম unparliamentary, প্রায় অশ্লীল। ঘুসদাতা অবশ্য অতটা

স্পর্শকাতর নয়, 'ঘুস দিয়েছি' এমন কথা হয়ত শোনা যেতে পারে তার মুখে, কিন্তু যাকে দিয়েছে তার সামনে নয়।

চতুর্বৃত্তির মধ্যে প্রথম ও পূর্ণলক্ষ্মী বাণিজ্য হল দানপ্রধান বৃত্তি; অর্থাৎ ঘুস দিতে বাণিজ্যবৃত্তিক যত দক্ষ, নিতে তত নয়। রাজসেবার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। গ্রহণ প্রধান এই বৃত্তির অনুগামীরা ঘুস নিতে যেমন দক্ষ, দিতে তেমন নয়। অবশ্য এই দুটি বৃত্তিতেই দান ও গ্রহণ উভয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ঘটে; বণিক (অপর বণিকের কাছ থেকে) ঘুস নিচ্ছেন এবং রাজকর্মচারী (অপর রাজকর্মচারীকে) ঘুস দিচ্ছেন এমন দৃশ্য মোটেই বিরল নয়। তবু বণিক মুখ্যতঃ দাতা ও রাজকর্মচারী মুখ্যতঃ গ্রহীতা।

অবশিষ্ট দুটি বৃত্তি কৃষি ও ভিক্ষায় ঘুস নেবার সুযোগ অতীব বিরল, এরা প্রায় সর্বদাই ঘুসদাতা। ভিক্ষাবৃত্তিতে ঘুসের ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সাধারণে জানেন না। ক্লাসিকাল ভিক্ষাবৃত্তি ('অন্ধ নাচার বাবা!') *চালাতে কলকাতার বিভিন্ন স্পটে ঘুসের* কারেন্ট রেট কত শুনলে অনেকেরই চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। আর আধুনিক উন্নতশ্রেণীর ভিক্ষা -- যার জন্য নিবিড় পদ্ধতির চাষ দরকার -- যেমন সাহিত্যের আকাদেমি পুরস্কার পাবার উমেদারি, তাতে ঘুস লাগে কিনা, লাগলে রেট কী, এসব প্রশ্ন করে আমাকে মুস্কিলে ফেলে আপনার লাভ নেই। ওর উত্তর আমি জানি না। এ সব অসুবিধাকর topic ছেড়ে দিয়ে আমরা তাই বাণিজ্য ও রাজসেবার উৎকোচ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া হচ্ছে লগ্নী, investment. সফল বণিক জানেন লগ্নী কখনও একেবারে ব্যর্থ হয় না। আয়রণ অ্যান্ড স্টিলে যদি বিশ পার্সেন্ট, সিমেন্টে না হয় দশ। সম্পূর্ণ bad investment বলে কোনো কথা পরিশীলিত বণিকের অভিধানে নেই। আজ যাতে লোকসান হচ্ছে কাল তাতেই লাভ হবে। নাফা আর ঘাটা দুই ডানা কাঁপিয়ে ইনভেস্টমেন্টের লক্ষ্মীপ্যাঁচাকে রজনীর অন্ধকারে উড়তে হয় -- ঋদ্ধি-সিদ্ধি-শুভ-লাভ অভিমুখে। ঘাটা হবার ভয়ে যে ভীরু ইনভেস্টমেন্টে পরাঙ্মুখ হয়, সিদ্ধিদাতা গণেশের পদপ্রান্তে সে পৌঁছবে কি করে!

ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক bad investment হচ্ছে সেই লগ্নী যাতে ঝুঁকি নেই। ঝুঁকি নেই মানে লাভও নেই। পাঁচটা ঘোড়ার দৌড়ে পাঁচটার ওপরেই place-এ খেলা, দুটোর লগ্নীতে পাঁচ টাকায় ছ টাকা করে আসবে -- বাকি তিনটেয় তিন পাঁচে পনের টাকা ডুববে। এ রকম সাবধানী জুয়ো বাণিজ্যে চলে না। বাণিজ্য হল জ্যাকপটের খেলা, ডুবি তো ডুবব, যেদিন লাগবে সেদিন সব ক্ষতি উসুল হয়ে যাবে। স্যাকরার টুকটাক নয়, কামারের ঘা।

সব রকম লগ্নীর মধ্যে ঘুসের লগ্নী হল সেরা লগ্নী -- মিনিমাম রিস্কে ম্যাক্সিমাম প্রফিট যদি কোথায়ও থাকে তো ঘুসে আছে। এ লগ্নী ডুবলে ছিটেফোটা, লাগলে গন্ডার-ভান্ডার। আড়াই টাকার place-এর টিকিটে জ্যাকপটের চান্স নেওয়া একমাত্র ঘুসের ক্ষেত্রেই সম্ভব। বণিক তাই ঘুস দিতে পারলেই বর্তে যায়, অপবর্গ লাগের কৈবল্যানন্দ হয় ঠিক পার্টিকে ভাল রকম ঘুস খাওয়াতে পারলে।

যে বণিক ঘুস দেবার আগে খুঁটিয়ে বুঝতে চায় কত ঘুস দিলে তার কত লাভ হবে, সৌকড়া (percentage) হিসাবের মানসাংক কষে আর ভাবে আরও একটু দরাদরি করবে

কিনা, সে হল অধম বণিক। পূর্ণলক্ষ্মী বাণিজ্যবৃত্তিতে তার স্থিতি অনিশ্চিত।

যে বণিক ঘুস দেবার আগে অতটা হিসেব করে না বটে, কিন্তু ঘুস দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তি বা প্রত্যাশা অনুসারে লাভের কড়ি গুণতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সবুরের গাছে আশ্চর্য স্বাদু ও পুষ্টিকর মেওয়া ফলার খবর জানে না বলে ঘুসের বীজ ফলতে একটু দেরি হলেই অসহিষ্ণু হয়ে ছটফট করে, সে হল মধ্যম বণিক। সাবধানী ঘুসখোর তার কাছে দ্বিতীয়বার ঘুস নিতে ইতস্ততঃ করবে -- কারণ এ রকম ঘুসদাতার ছটফটানিতে গোপন কথা ফাঁস হবার সম্ভাবনা -- ফলে মধ্যম শ্রেণীর বণিক পূর্ণলক্ষ্মী লাভ করবে না; কৃষিজীবীর মনোবৃত্তি নিয়ে সে অর্ধলক্ষ্মী মাত্র লাভ করবে।

যে বণিক ঘুসের পাত্রটির নিটোলত্ব ছাড়া আর কোনো কিছুর পরোয়া করে না, নিশ্ছিদ্র উপযুক্ত ঘুসগ্রাহক পেলে তাকে যে যে-কোন পরিমাণ ঘুস দিতে প্রস্তুত, সেই হল উত্তম বণিক ঠিক জায়গায় লগ্নী করতে পারলে ধূলিমুঠি সোনামুঠি হয়, বাণিজ্যের এই মূলসূত্র জানা উত্তম বণিক যখন সোনামুঠি লগ্নী করতে পারে তখন জানে তাতে হীরামুঠি ফলবেই ফলবে। দু দিন আগে বা পরে। উত্তম বণিক চাণক্যের উপদেশ মেনে কাকের কাছ থেকে 'লক্ষৈকদর্শিতাং ধার্ষ্ট্যং যথাকালে চ সংগ্রহম্ অপ্রমাদমনালস্যং' পঞ্চগুণ শিখে নিয়েছে, লজ্জা-ঘৃণা-ভয় পরিত্যাগ করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনলস সহিষ্ণুতা তার অনুশীলিত প্রকৃতি; ঘুসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাই উত্তম বণিকেরই আয়ত্তে।

।। ২ ।।

বাণিজ্যে যেমন ঘুস কেবল উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য হল লাভ -- সীমাহীন বল্গাহীন নীতিহীন তৃপ্তিহীন লাভ, রাজসেবায় তেমন নয়। এখানে ঘুসই উদ্দেশ্য, চাকরি হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যের বিধেয়। ঘুসের জন্যই চাকরি, মাইনেটা নলচে আড়াল, এ রকম কেস রাজসেবায় আকছার চোখে পড়বে। আগে অনারারী চাকরি ছিল কিছু কিছু, সেগুলো এখন আর ফ্যাশান-দুরস্ত নেই। এখন ঘুস চাইবার জন্য বিনে মাইনের ছুতো দরকার হয় না, বরং মাইনের অঙ্কের সঙ্গে ঘুসের অঙ্কের একটা হারাহারি সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেছে বলে রাজকর্মচারী কম মাইনের চাকরিতে এখন আর তুষ্ট নয় -- 'উপরি'র ব্যবস্থা যথাযোগ্য থাকলেও নয়।

যে রাজকর্মচারী প্রতিটি রাজকর্মে দস্তুরি অর্থাৎ ঘুস দাবি করেন, তিনি অধম ঘুসখোর। তাঁর কাছে মুড়ি মিছরি একদর, অল্প লাভে

অধিক বিক্রয় তাঁর নীতি বলে তিনি কোন্‌টি রাঘব বোয়াল আর কোন্‌গুলো চুনোপুঁটি তা বোঝার চেষ্টাও করেন না, সকলের কাছ থেকে একই রেটে ঘুস দাবি করেন তিনি। অধম ঘুসখোরের তাই পেট না ভরতেই জাত যাবার সম্ভাবনা। এঁরাই পাবলিকের হাতে মাঝে মাঝে অপদস্থ হন, এঁরাই ক্বচিৎ কখনো ঘুসের দায়ে মামলায় পড়েন, বরখাস্ত হন।

যিনি দশটি কাজের ন'টি বিনা ঘুসে করেন -- কারণ সে কাজগুলো এতই অকিঞ্চিৎকর যে কেউ ঘুস নিয়ে সাধাসাধি করেনি -- এবং দশম কাজটিতে ঘুসের অংক এমন হাঁকেন যে ফ্রী সার্ভিসের ন'টি কাজের নাহক ক্লেশ তাতেই পুষিয়ে যায়, তিনি মধ্যম ঘুসখোর। এঁদের মধ্যে যাঁরা একটু বেশি সেয়ানা, তাঁরা মাঝে মাঝে ঐ দশম কাজটিতেও ঘুস নিতে রাজি হন না (দরটা যদি না যৎপরোনাস্তি আকর্ষণীয় হয়), এমন কি ঘুসের offer-এর খবর জানিয়ে নালিশও করেন কভি কভি। এই কৌশলটি বণিক-শ্রেণীর মত লগ্নী করার কৌশল। এর ফলে ইন্টারন্যাল বাজারে অর্থাৎ ওপরওলার কাছে তাঁর সাধুতার সুনাম রটে এবং এক্সটার্নাল বাজারে অর্থাৎ ঘুসদাতাদের কাছে তাঁর দর বাড়ে। এঁরা দশটির মধ্যে একটির বদলে একশোটির মধ্যে একটিতে -- হয়ত হাজারের মধ্যে একটিতে -- ঘুস খান এবং সেই শতকরা বা হাজারকরা একটি অংকেই না-নেওয়া ঘুসের লোকসান ভালভাবে পুষিয়ে নেন।

মধ্যমশ্রেণীর সেয়ানা ঘুসখোর কিন্তু উত্তম শ্রেণীর ঘুসখোর বলে গণ্য নন; এর প্রধান কারণ এই যে এরকম কৌশল বেশি দিন বজায় রাখা যায় না। যার কাছে একবার ঘুস খেলেন তাকে আর একবার প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। যার সঙ্গে একবার মদ্যপান করেছি তার নিমন্ত্রণ আর এক সন্ধ্যায় উপেক্ষা করি কি করে? যার সঙ্গে একবার ব্যভিচার করেছি তার কাছে নিজেকে সতী-সাবিত্রী-শুকদেব-জোসেফ বলে চালাই কোন্ মুখে? কাজেই হাজারে এক থেকে দশে এক হতে বেশি সময় লাগে না মধ্যম শ্রেণীর ঘুসখোরের। নতুন বলের জেল্লা কেটে গেলেই মধ্যম শ্রেণীর স্পিন বোলিং চালিয়ে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত।

উত্তম শ্রেণীর ঘুসখোর হচ্ছেন ঘুসের প্রকৃত শিল্পী ব্যক্তি। শিল্প যেমন বাঁধা ছকের সংজ্ঞা মানে না, উত্তম ঘুসখোরেরও তেমনই সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। ইনি এক প্রকার নন, বহু প্রকারের। কখনও ইনি ভিজিল্যান্স অফিসার, অন্যের ঘুস খাওয়া ঠেকানোর জন্য জীবনপাত করছেন এবং জীবনপাতের ফাঁকে ফাঁকে এক একটি মোটা দাঁও মারছেন, কখনও ইনি বিভাগীয় প্রধান, ফোঁটা-তিলক কাটা বর্ষীয়সী মাসীর মত সদুপদেশের তুলসীমঞ্চেই সারাটি দিন কাটিয়ে দেন, মাঝরাতে পুঁটিদের শরীর পাত করা উপার্জনের অর্ধেক যে দালাল মারফত মাসীর হাতেই যাচ্ছে সে খবর পুঁটিরাও জানে না। যে কৌশলেই হোক, উত্তম শ্রেণীর ঘুসখোর কোটেরিভুক্ত মুষ্টিমেয় ভক্তের বাইরে সকলের কাছে সাধুতার প্রতিমূর্তি বলেই বন্দিত।

ঘুসদাতা ও ঘুসগ্রহীতার উত্তমাধম শ্রেণীবিন্যাস শুনলেন। আর একটি মাত্র বিষয়ের নিবেদন করেই উৎকোচ সংহিতার এই দ্বিতীয় কিস্তিতে সমাপ্তিরেখা টানতে হবে; নইলে স্থান এবং কাল উভয়েরই অনটন ঘটতে পারে। পত্রিকায় বরাদ্দ করা স্থান এবং প্রেসে যাবার ডেড লাইন, সুসাহিত্যের দুই শত্রু এখনই চোখ রাঙাচ্ছে।

সেই একটি মাত্র বিষয় তাহলে হোক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উৎকোচের দার্শনিক ভিত্তি। Philosophy of bribery.

।। ৩ ।।

দর্শন, philosophy, শুনেই রসিক পাঠক হাই তুলছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু মা ভৈঃ উৎকোচ দর্শন যাতে শ্রী অরবিন্দ বা সার্ত্রের দর্শনের মত দুরূহ তথা অনাকর্ষণীয় না হয় সেজন্য আমি তত্ত্বকথাকে কাহিনীর ছদ্মবেশ পরিয়ে এনেছি। আশা করি সুশীল পাঠকের বিরক্তি উৎপন্ন করব না।

ঘুসের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি দুটি, একটি দেবার, একটি নেবার। দেবার তত্ত্বটি আমাকে দান করেছেন ইন্‌কাম ট্যাক্সের একজন প্রখ্যাত উকিল, যাঁর প্রকৃত নাম সকলের মত আমিও ভুলে গেছি, কারণ তিনি রসগোল্লা ত্রিবেদী নামেই জনপ্রিয়। রসগোল্লার মতই তিনি গৌরবর্ণ, রসগোল্লার মতই বর্তুলাকৃতি এবং রসগোল্লার মধুর রসের মতই তাঁর মুখে সর্বদা সুমধুর হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ হাসিটি গড়িয়ে পড়ছে, এই কারণেই তিনি রসগোল্লা নামে পরিচিত।

রসগোল্লার পুত্র মনোহর ত্রিবেদী একদা উপযুক্ত প্রাথমিক সার্ভে না করেই এক তরুণ

রাজপুরুষকে ঘুস অফার করেছিলেন। মনোহর অত্যন্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন কারণ বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে যেমন প্রারম্ভিক উপাচারের কনসার্ট না বাজিয়ে আসল অপেরা অর্থাৎ অপারেশন করা বারণ, উৎকোচ সংহিতার বিধানে তেমনি নিয়ম হচ্ছে ঘুস দেবার আগে একটু হেঁ-হেঁ করে আবহসংগীত গাইতে হবে। এই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপুরুষ রসগোল্লাকে এত্তেলা পাঠালেন এবং তৎপুত্রের এবম্বিধ উদ্ধত গোস্তাকির জন্য রসগোল্লাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করলেন। পিতা ত্রিবেদী স্বভাবসিদ্ধ হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ রসস্রাব করতে করতে সব ভর্ৎসনা মাথা পেতে নিলেন। কেবল রাজপুরুষ যখন উপসংহারে বললেন, 'আপনার ছেলের ব্যবহারে আপনার লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া উচিত, ওইটুকু ছেলে এখনই ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইছে!' তখন রসগোল্লা তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকথাটি যুক্তকরে নিবেদন করলেন :

'এতে লজ্জাসরমের কী আছে তা তো আমি বুঝলাম না, সার। কেউ কেউ ঘুস নিয়ে থাকেন, তাঁদেরকে আমরা ঘুস দিয়ে থাকি। আবার কেউ কেউ ঘুস না নিয়ে থাকেন তাঁদেরকে আমরা ঘুস না দিয়ে থাকি। আপনি যদি নিতে না চান, আপনাকে দেব না।'

'কোই লেতে ভি হ্যাঁয়, উসকো হম দেতে হ্যাঁয়; কোই ন লেতে হ্যাঁয় তো উসকো হম নহি দেংগে।' — রসগোল্লার এই সহজিয়া দর্শন ঘুসের জগতে বিস্ময়কর সত্ত্বগুণান্বিত তত্ত্ব।

এই তত্ত্ব শোনার পরই আমি সংকল্প করেছি রসগোল্লা আমাকে ঘুস অফার করলে আমি না বলব না। না বলে লাভ নেই, কারণ

রসগোল্লা সহজিয়া সাধনায় জেনে গেছে কেউ ঘুস নেয়, তাকে দিতে হয় আর কেউ ঘুস নেয় না, তাকে দিতে হয় না।

কিন্তু হায়, রসগোল্লা কেন তার ছেলে পান্তুয়াও আজ পর্যন্ত আমাকে ঘুস নিয়ে সাধল না। নীরব কবির কাব্যের মত আমার মনের সংকল্প মনেই থেকে গেল।

ঘুস নেবার তাত্ত্বিক জ্ঞানে আমার পূজনীয় গুরুদেবের নাম সহস্রকুমার গুপ্ত। প্রাতঃস্মরণীয় কৃতী পুরুষ, তাঁর একখানি জীবনীগ্রন্থ রচনার ইচ্ছে আছে আমার, মানহানির মকদ্দমার ভয়ে সাহস পাচ্ছি না। কুলোকে বলে ওঁয়ার নামের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে পঞ্চাশের দশকেও উনি সহস্র অর্থাৎ হাজার টাকার কম অঙ্কের ঘুস স্পর্শ করতেন না। এবং এমনই গুপ্তভাবে কাজটি করতেন যে ওঁর বাঁ হাত কি করছে তা ডান হাত টের পেত না। বলা বাহুল্য যে এ গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমাকে বড়ই স্নেহ করতেন সহস্রকুমার। অবসর গ্রহণের দিন আমাকে কাছে ডেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা রামচন্দ্রের প্রতি মৃত্যুবাণাহত লঙ্কেশ্বরের রাজনীতি উপদেশের সংগে তুলনীয়। সহস্রকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ টেলিগ্রাফিক ইংরেজিতে বলেছিলেন, 'Mr. Sarma, you have worth. Worth deserves reward. Who will reward you? None will reward you. You must reward yourself.' অর্থাৎ বাপু হে, তোমার এলেম আছে, এলেমের তো পুরস্কার পাওনা হয় কিন্তু কে তোমাকে পুরস্কার দেবে শুনি? কেউ দেবে না, কাজেই নিজেই নিজেকে পারিতোষিক দিও।

শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল।

।। ৩।।

শুধু টেলিগ্রাফিক নয়, গ্রাফিক এই উপদেশকে জীবনবেদ করে কেউ যদি ঘুস খেতে শেখে তবে তাকে শুধু ভিজিল্যান্স, অ্যান্টিকরাপশন, সি. বি. আই., ইত্যাদি বহিঃশত্রু সামলাতে হবে, বিবেক নামক গৃহশত্রু তাকে আর একটুও গালমন্দ করবে না।

আর ওই লোকটাই তো সব নষ্টের গোড়া, যাত্রাগানে সেই যে লোকটা গেরুয়া পোশাক গেরুয়া পাগরি পরে হঠাৎ এসে হাত বাড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠত, ভিলেনের হাতে খড়্গ খসে না পড়া পর্যন্ত গান গেয়ে গেয়ে ভিলেন ও দর্শককে bore করে মেরে ফেলত যে লোকটা। সি.বি.আই. নয়, ওই বিবেকই হল ঘুসখোরের পয়লা নম্বর শত্রু। ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারলেই ঘুসখোর নিরঙ্কুশ।

আর তত্ত্বজ্ঞানই হচ্ছে বিবেক মারার নিশ্চিত ও নিরাপদ উপায়। □

শনিবারের চিঠি

নিয়মাবলী

এজেন্টদের জন্য :

- কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় এজেন্সি দিতে আমরা ইচ্ছুক।
- এজেন্টরা চিঠি লিখলে আমাদের ছাপানো নিয়মাবলী পাঠানো হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

	স্বাভাবিক হার	চুক্তি অনুসারে হার
এক পাতা	২,০০০/-	১,৮০০/-
আধ পাতা	১,২০০/-	১,০০০/-
১/৪ পাতা	৭৫০/-	৬০০/-
এক কলাম	৭৫০/-	৬০০/-
১/২ কলাম	৪০০/-	৩৫০/-
চতুর্থ মলাট (চার রঙ)	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
ভেতরের দ্বিতীয় মলাট (সাদা কালো)	২,৫০০/-	২,২০০/-

রঙীন বিজ্ঞাপনের জন্য :-

ভেতরের পাতায় প্রতিটির জন্য ১০০% অতিরিক্ত। ট্রান্সপারেন্সি গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি অতিরিক্ত ট্রান্সপারেন্সির জন্য ৫০০ টাকা বেশি

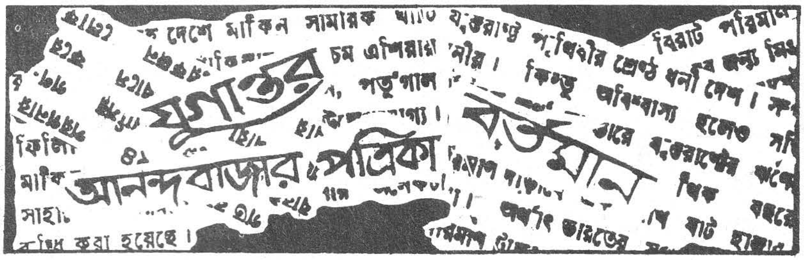

সাদা চোখে

উকিলের জেরার মতো সাংবাদিকের জেরাও যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সেসম্পর্কে অনেক গল্প আছে। যেমন একটা গল্প হল, গণ্যমান্য একজন বিদেশী অতিথি বিমানবন্দরে এসে নামতেই একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি এই শহরে কোন নাইট ক্লাবে যাবেন কি? মাননীয় অতিথি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে নাকি কোন নাইট ক্লাবের ঠিকানা? পরের দিন ফলাও করে খবর বেরোল, বিদেশী অতিথি বিমানবন্দরে নেমে প্রথমেই যা জানতে চেয়েছেন তা হল শহরের কোন নাইট ক্লাবের ঠিকানা।

গল্পটি মনে পড়ল গত সপ্তাহে একদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রশান্ত শূরের একটি বক্তব্যের রিপোর্ট পড়ে। পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর কলকাতায় বেআইনি বাড়ি ভাঙার সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলেন সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। কথা প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, যতদিন না কলকাতার লোক সভ্য হচ্ছেন ততদিন কিছু করা যাবে না। এই কথা বলেই সম্ভবত শূর মশাইয়ের হুঁস হয় যে, তিনি বেফাঁস কথা বলে বিপদে পড়ে যেতে পারেন, বিশেষ করে পৌর নির্বাচনের আগে। তাই তিনি (আনন্দবাজারের রিপোর্ট অনুযায়ী) একটি ইংরেজি কাগজের সাংবাদিককে লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন, আপনারা আবার উল্টোপাল্টা লেখেন। সিভিলাইজ্‌ড্ বলতে আমি বলতে চেয়েছি – "সো ফার অ্যাজ সিভিক সার্ভিস ইজ কনসার্নড লেট দ্য পিপল অব ক্যালকাটা বি সিভিলাইজড অ্যান্ড ল অ্যাবাইডিং

আনন্দবাজার পত্রিকার ২৭ জুনের সংখ্যায় প্রশান্ত শূরের এই বক্তব্য প্রথম পৃষ্ঠায় বেরোয় "কলকাতার লোক সভ্য না হলে কিছু করা যাবে না: শূর" এই ডবল কলম শিরোনামে।

কলকাতার আর যে একটি মাত্র কাগজে সেদিন প্রশান্ত শূরের এই বক্তব্য বেরিয়েছিল সেটি হল বর্তমান। বর্তমান কিন্তু কলকাতার লোক সভ্য নয়, এমন কোন কথা প্রশান্তবাবুর মুখে বসায় নি। তাদের খবর ছিল, "মন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, এ শহরটার আর কিছু করা যাবে না। একটা লোক আইন মেনে চলে না। এদের কোন নাগরিক চেতনা নেই।"

২৮ জুন তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রশান্তবাবুর একটি প্রতিবাদ ছাপান হয়। তাতে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদকে মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করে বলেন যে একজন বাড়ির মালিক তাঁর নির্মীয়মাণ বাড়ি না ভাঙার জন্য আবেদন জানাতে এলে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বলেছিলেন, কলকাতা শহরের উন্নতি করতে হলে আমাদের সকলকেই শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে। তা না হলে কলকাতার সার্বিক উন্নতি এবং সৌন্দর্য বিধান করা সম্ভব নয়।

আগের দিন কর্পোরেশন অফিসে বসে পৌরমন্ত্রী 'একাধিক রিপোর্টারের সামনে' যা বলেছিলেন তাই ছাপা হয়েছে, স্টাফ রিপোর্টারের এই মন্তব্য সহ প্রশান্তবাবুর প্রতিবাদটি আনন্দবাজার ছাপিয়ে দেয়।

আনন্দবাজারের এই দুটি রিপোর্ট মিলিয়ে পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রশান্ত শূর কলকাতার মানুষদের মধ্যে সভ্যতার অভাবের কথা যদি বলেও থাকেন তাহলেও সেটা বলেছিলেন শহরের মানুষদের মধ্যে নাগরিক চেতনার অভাবের অর্থে এবং বেআইনি বাড়ি তৈরির প্রসঙ্গে। তাছাড়া তিনি সেকথা সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন নি, যদিও তাঁদের সামনেই বলেছিলেন অন্য একজনের আবেদনের উত্তরে।

— প্রশান্ত শূর —

একথাও বোঝার অসুবিধা নেই যে, প্রশান্ত শূরকে তাঁর নিজের কথার জালে জড়িয়ে একটি ভাল 'কপি' তৈরি করার সুযোগ আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকরা ছেড়ে দিতে চান নি। অথচ তা করতে গিয়ে তাঁরা যে সাংবাদিক সততার কোন নিয়মভঙ্গ করেছেন তাও বলা যাবে না। (যদি অবশ্য ধরে নেওয়া যায় যে, বেআইনি বাড়ি তৈরির প্রসঙ্গে শূর মশাই সত্যিই কলকাতার নাগরিকদের মধ্যে সভ্যতার অভাবের কথাটা বলেছিলেন)। কেননা, শূর মশাই তাঁর ঐ বক্তব্যের ভিত্তিতে কোন সংবাদ তৈরি করতে সাংবাদিকদের স্পষ্ট করে নিষেধ করে দেন নি, বরং ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁর কথাটা কাগজে ছাপা হবে। চতুর সাংবাদিকতার ওস্তাদি প্যাঁচের একটি ভাল উদাহরণ।

আনন্দবাজার পত্রিকার চতুরতা প্রকাশ পেয়েছে শুধু প্রশান্ত শূরের বক্তব্যটি এভাবে ছাপানর মধ্যেই নয়। এটি ছাপান হয়েছে সি পি এম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নোত্তরের সংবাদের পাশে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের খবরের শিরোনাম ছিল "ফ্রন্ট জিতবে: বুদ্ধদেববাবু"। তারই পাশে ডবল কলম শিরোনামে প্রশান্ত শূরের বক্তব্য বুদ্ধদেববাবুর বক্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজক ছিল সন্দেহ নেই। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও সেটা লক্ষ্য করেছেন এবং প্রেস ক্লাবের 'মিট দি প্রেস' অনুষ্ঠানে সেকথা উল্লেখও করেছেন। (জ্যোতিবাবুর সেই বক্তব্য আনন্দবাজার ছাপাতে ভোলে নি।)

রিপোর্টে যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও আনন্দবাজার বলতে ছাড়ে নি তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট ছিল শুধু প্রশান্তবাবু যা বলেছেন তাই নয়, তাঁর সেই বক্তব্যের 'অনুসিদ্ধান্ত'ও। কী সেই অনুসিদ্ধান্ত? আনন্দবাজারের প্রবন্ধকারের মতে "এই সুগভীর বাণীর অনুসিদ্ধান্ত: কলকাতায় কিছু করা যাইতেছে না, কারণ এই নগরীতে সভ্য লোক নাই।"

পশ্চিমবঙ্গের যে দুজন মন্ত্রী সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সংবাদপত্রে বহুল প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন যতীন চক্রবর্তী আর একজন প্রশান্ত শূর। দুজনকেই এই চেষ্টার মূল্য দিতে হয়েছে।

৩০.৬.৮৫ **দিশাহারা শর্মা**

মুক্তাঞ্চল

খুন করে বেলঘরিয়ায় শাস্তি হয় না

বেলঘরিয়ার বিভা সিনেমাকে ঘিরে তার চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলেছে সমাজবিরোধীদের উন্মত্ত দাপট। উত্তাল বেলঘরিয়ার সর্বত্র দু দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ। সমাজবিরোধীদের দল, উপদল, তার আবার উপদল এবং পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি এই নিয়ে বেলঘরিয়ায় এখন গড়ে উঠেছে এক হিংসাত্মক পরিস্থিতি। এবং এর ফলে বেলঘরিয়ার স্থানীয় জনসাধারণ ভয়ে, আতংকে এবং বোমাবাজিতে বিপর্যস্ত। এই প্রতিবেদক বেলঘরিয়ায় এ ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে স্থানীয় লোকেরা প্রতিবেদকের কাছে প্রচুর অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন, এই গন্ডগোল সি. পি. এম ও কংগ্রেসের দুই দল সমাজবিরোধীর মধ্যে। এবং স্থানীয় পুলিস এই গন্ডগোল দমনে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এদিকে কামারহাটির প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক প্রদীপ পালিত ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মিলন ঘোষের মতে বেলঘরিয়ার দেশপ্রিয়নগরের এক পরিবার কট্টর কংগ্রেস সমর্থক। সেই দাশগুপ্ত পরিবারকে বেলঘরিয়া থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার জন্য সি. পি. এম-এর মদতপুষ্ট গুন্ডারা প্রশাসনের সহযোগিতায় অবাধে এই পরিবারের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই পরিবারের সকলকে বেলঘরিয়া-ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পৈতৃক বাড়িটাকেও দখলের চেষ্টা চলছে।

যাইহোক, এই বিবাদের সত্যানুসন্ধান করতে হলে আমাদের একটু পিছন দিকে তাকাতে হবে। একটু পিছন দিকে তাকালে দেখা যায় যে প্রদীপ ও তার দলবল আগের যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে সি. পি. এম-এর মদতে গুন্ডামী করে আসছে। এদের প্রধান কাজ হলো কামারহাটির সাগর দত্ত স্কুলের সামনে মাল বোঝাই লরি থামিয়ে তার থেকে মাল নামানো, বিভা সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাক করা ও কিছু দোকান থেকে জোর করে মাসোহারা নেওয়া, ইত্যাদি। এই মাল বোঝাই লরি থেকে মাল নামানোর ব্যাপারে বহুদিন আগে একবার রাধিকা ব্যানার্জী ওদের হাতে হাতে ধরেছিলেন ও প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠাবসা করিয়েছিলেন। এই প্রদীপ সেনের সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থিত সেই দাশগুপ্ত পরিবারের এক ছেলে ঝাপ্পুর গোলমাল লাগে টাকাপয়সার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে। ঝাপ্পুও প্রদীপের মতই এক সমাজবিরোধী। সে ১৯৮৩ সালে বরানগরে এক ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে বহুদিন জেল খাটে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাপ্পু প্রদীপ যে সব এলাকা থেকে মাসোহারা নেয় সেইসব এলাকায় হাত বাড়ায় টাকা নেওয়ার জন্য। আর তখনই এলাকা দখল নিয়ে যুদ্ধ লেগে যায় দু দলে। এরপরে একবার ঝাপ্পুকে প্রদীপের দল মেরে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু ঝাপ্পু খুব ভাগ্যক্রমে সেবার বেঁচে যায়। তারপর থেকে গন্ডগোল আরো বেড়ে যায়। ঝাপ্পুকে প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। প্রথম প্রথম প্রদীপের দল ঝাপ্পুকে মারবার চেষ্টা করে কিন্তু ঝাপ্পু পালিয়ে যাওয়ায় ঝাপ্পুকে না পেয়ে শুরু হয় ঝাপ্পুর পরিবারের উপর অত্যাচার।

১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ তারিখে প্রথম প্রদীপের দল ঝাপ্পুর ভাই বিশ্বজিৎ

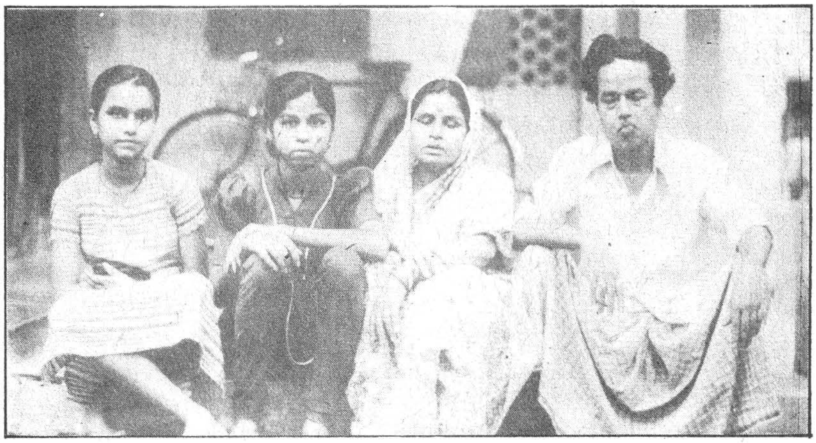

ঝাপ্পুর বাবা, মা ও বোনেরা।

দাশগুপ্তকে বাড়ির সামনেই নৃশংসভাবে আক্রমণ করে। এই ঘটনা ঘটে সকাল ৯টায় সকলের চোখের সামনে। এরপর শুরু হয় দাশগুপ্ত পরিবারের উপর একের পর এক আক্রমণ। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঝাপ্পুদের বিভা ক্যাম্পের বাড়িতে রাত ১১টা ৩০ মিনিটের সময় প্রদীপের দল ঝাপ্পুদের বাড়িতে ঢুকে ঝাপ্পুর মা আলোরানী দেবীকে ও ষোলো বছরের বোন শিখাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। এই ঘটনার পর ঝাপ্পুর বাবা গৌরাঙ্গ দাশগুপ্ত আর বিভা ক্যাম্পের বাড়িতে থাকতে ভরসা পান না। তিনি সপরিবারে দেশপ্রিয়নগরে নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে চলে আসেন। কিন্তু মার্চ মাসের ছ তারিখেই আবার প্রদীপের দল ঝাপ্পুদের দেশপ্রিয়নগরের বাড়ি আক্রমণ করে এবং দু ঘন্টা ধরে অবাধে লুঠতরাজ ও খুনের চেষ্টা চালায়। এই আক্রমণে ঝাপ্পুর বাবা গৌরাঙ্গ বাবু, তার দুই মেয়ে ও স্ত্রী আলোরানী দেবী গুরুতরভাবে আহত হন। এই আক্রমণ চলে রাত ১২টা থেকে প্রায় ২টো পর্যন্ত। কিন্তু এই দু ঘন্টার মধ্যে আশেপাশের জনসাধারণ ভয়ে প্রদীপের দলকে বাধা দিতে সাহস করেন না।

এই ঘটনার পর স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা প্রদীপ পালিত ও আরো কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা এই প্রতিবেদককে জানান, সেদিনের ঘটনার পর বেলঘরিয়া থানা অভিযোগকারীদের কাছ থেকে ডাইরি পর্যন্ত নেয়নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে দু মাস পর পর তিনবার একই পরিবারের ওপর এরকম আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও পুলিস এখন পর্যন্ত একজন বাদে আর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ অপরাধীরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনার সমাধান প্রার্থনা করে ঝাপ্পুর জেঠীমা দিল্লিতে ও রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে পত্র মারফৎ আবেদন করেছেন। জ্যোতি বসু সেই আবেদনের উত্তরে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তারপরেও বিভা সিনেমার সামনে দাশগুপ্তদের বড় মিষ্টির দোকানটি ভাঙচুর হয়। ওদিকে আবার বদলা হিসেবে প্রদীপের দলের ছেলে বাঁ হাত কাটা আশিসের বৃদ্ধ বাবাকে ঝাপ্পুর দল কুপিয়ে হত্যা করে। এই একের পর এক খুনের জন্য এলাকার মানুষ জন এখনও আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁদের ধারণা এই গন্ডগোল সহজে মিটবে না। যদিও ঝাপ্পু গত ৮ মে তারিখে বরাহনগরের দর্জিপাড়া থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে।

এলাকার জনগণ মনে করেন ঝাপ্পু ছাড়া পেলে আবার গেলমাল শুরু হবে। এক কথায় সাধারণ মানুষ প্রদীপ সেনের দল ও ঝাপ্পুর দলের ওপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ। শুধু ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারছে না। □

বিশেষ প্রতিনিধি

সুবাস

প্রভাত দেবসরকার

শেষ ফোঁটাটুকু নিঃশেষ না হলে এ গল্পের শুরু হত না। হয়তো আর কোন কালে মনেও পড়ত না গল্পটা।

রুমালে সেন্ট ব্যবহার করা আমার অভ্যাস নয়। হাতের কাছে দ্বিতীয় পরিষ্কার একখানা রুমাল পেলে সেন্টের শিশির খোঁজ করতুম না। এ রুমালখানা নেহাতই ব্যবহারের অযোগ্য, যেমনি ময়লা আর তেমনি দুর্গন্ধ!

কিন্তু নিরুপায়, আজকের মত ওইতেই কাজ চালাতে হবে, একটু ছেঁড়া ন্যাকড়াও ধারে-কাছে নেই যে ময়লা রুমালখানা বাতিল করি। মনটা খুঁতখুঁত করছে, রুমালটা ফেলতেও পারি না, রাখতেও পারি না। বেরুবার মুখে কি মুশকিল!

হঠাৎ উপায়টা মাথায় এল। উপস্থিত এক ফোঁটা সেন্ট ঢেলে গন্ধটা ঢেকে দিলে আজকের মত কাজ চলে যাবে, তারপর অবসরমত কাল কেচে পরিষ্কার করে নিলে আর খুঁত থাকবে না।

দুনিয়ায় হাতের কাছে কোন জিনিসই আমাদের মত লোকের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে না, ইচ্ছেমত পাওয়াও যায় না -- দরকারমত খুঁজে-পেতে নিতে হয়। সেন্ট সংগ্রহ -- সে আর এক পর্ব!

সেন্টের শিশিটা হাতে নিয়ে বিশেষ যত্নসহকারে নিরীক্ষণ করে যা বোঝা গেল তাতে ভরসা পাবার কিছু নেই। ঠিকমত ফোঁটাটা যদি শিশির তলপেট দিয়ে মুখে এসে পৌঁছয় এবং উবে না গিয়ে করুণাবিন্দুর মত সিঞ্চিত হয় তবেই মান এবং মুখ রক্ষা। আজকের মত বাঁচোয়া!

প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে সেন্টের শিশিটা কাত করে ধরলুম। সন্তর্পণে লক্ষ্য করছি, শেষ ফোঁটাটা যেন ঠিকমত শিশির মুখের কাছে এগিয়ে আসে। প্রায় কাঠ হয়ে গেছি।

সেন্টের শিশির তলা চুঁইয়ে ফোঁটাটা শিশিরবিন্দুর মত ঠোঁটের আগায় টলটল করছে, আর একটু একটু করে ফোঁটাটা বড় হয়ে ফুটে উঠুক। তার পর --

সে অনেক দিন আগের কথা। জলপথ আর স্থলপথে তখন যান-বাহন বলতে স্টীমার আর রেল বোঝাত। তখন এত রাস্তাঘাটও হয় নি, বাস-মোটরেরও চলন হয় নি। মোটর গাড়ি তখনও হাওয়া-গাড়িই ছিল।

ফলতার গঞ্জ থেকে উলুবেড়ে যেতে হলে তখন ওই জলপথে স্টীমারে চেপে যেতে হত। যে দুখানা স্টীমার তখন ওই পথে কলকাতা থেকে তমলুক পর্যন্ত যাতায়াত করত তাদের নাম এখনও মনে আছে -- ষোড়শী আর উর্বশী। তখন মনে হয় নি, এখন মনে হচ্ছে, আমার নামের সঙ্গে যেমন আমার চেহারার কোন মিল নেই, তেমনি স্টীমার দুটোরও নামের কোন মানে নেই -- মোটেই জলযান দুটো নয়নাভিরাম ছিল না, দুখানা গাধাবোট যেন!

বাবা আমাকে একলা যেতে দিতেন না। সঙ্গে লোক দিতেন আমাকে পৌঁছে দিয়ে আর নিয়ে আসবার জন্যে। আমি তখন উলুবেড়ের হাই স্কুলে পড়ি। মামার বাড়ি থাকি। গ্রীষ্মের ছুটি আর পূজোর ছুটিতে বাড়ি আসি। ফলতার কাছে শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে আমাদের বাড়ি।

সেবার পূজোর ছুটি হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা এখনও লোক পাঠান নি বলে বাড়ি আসতে পারছি না। মামারা আমার কথা শুনছেন না, রাজী হচ্ছেন না আমাকে একলা ছেড়ে দিতে। কত করে বললুম, এই তো সোজা পথ, ওঠা আর নামা! তার পর ওখান থেকে তো হেঁটেই যেতে হয় আমাদের গাঁয়ের বাড়ি। সব আমার জানা। এতটুকু ভুল হবে না, আমি হারিয়ে যাব না।

ছোটমামা বললেন, তাই কি হয়! এতটুকু ছেলেকে একলা ছাড়া ঠিক হবে না। চিঠি লেখা হয়েছে, ভবানী লোক পাঠাবে।

ভবানী আমার বাবার নাম। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হল। চিঠি যাবে, তার পর লোক আসবে, তার পর আমি যাব। কদিন ছুটি চলে গেল। মোটে এক মাস পাঁচ দিন ছুটি!

মহালয়ার আগের দিন বাবা লোক পাঠালেন। রাধানাথদাকে দেখে আমি কেঁদে ফেললুম। মামারা ধমক দিলেন : কাঁদবার কি আছে!

সত্যিই তো পূজোর ছুটিতে বাড়ি যাব, লোক এসেছে নিতে -- কাঁদবার কি আছে?

পরের দিন মহালয়া, কিন্তু অমাবস্যা, যাত্রা নাস্তি। আরও দুটো দিন নষ্ট হল। রাধানাথদার কি, দিব্যি বেড়াতে এসেছেন বেড়িয়ে যাচ্ছেন! দুদিন আগে আসতে কি হয়েছিল? রাধানাথদা আমাদের সরকার, সময়-সময় ইয়ার-বন্ধু। আমার রাগ দেখে রাধানাথদা কলকাতার গল্প করলেন -- পূজোয় আমাদের কার কি জামা-কাপড় হয়েছে তার মনোহারি বর্ণনা করলেন -- নাকি সবচেয়ে আমারই ভাল! জুতো-মোজা সুদ্ধু!

কিন্তু সেগুলো না-দেখা পর্যন্ত মন সুস্থির হচ্ছে না। আমারই যে সবচেয়ে ভাল তার ঠিক কি! রাধানাথদা বড় চালাক।

যাবার দিন রাধানাথদাকে ভোর থেকে তাড়া দিয়ে অস্থির করে তুললুম। বেচারা ভাল করে ঘুমতে পারে নি। বেলা বারোটায় 'উর্বশী' আসবে আর্মানি ঘাট থেকে সাঁতার কেটে, এখন থেকেই তাড়া! রাধানাথদা বিরক্ত হলেন। কিন্তু তাড়ায় কাজ হল। এগারটার মধ্যেই আমরা স্টীমার-ঘাটের দিকে রওনা হলুম।

এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। কে বলতে পারে আরও বেশী দেরি না হবে!

ঘাটে এসে রাধানাথদা বললেন, নাও, পড়ে পড়ে ঘুমোও। জোয়ার এসেছে।

নদীঘাট টৈটম্বুর। মাছির মত একটা-দুটো নৌকো এধার-ওধার হয়ে আছে, শাঁ-শাঁ জলের শব্দ, স্টীমার-ঘাটের জেটিটা যাতনার মত নড়ছে কেবল।

বুকটা আমার কেঁপে উঠল। আজ হয়তো 'উর্বশী' উলুবেড়ের ঘাটে ভিড়তেই পারবে না! যে জলের তোড়!

স্টেশন-ঘর টিনের চাল বাড়িটার আট-কাট বন্ধ। মানে নাম-গন্ধ নেই স্টীমারের। এত সকালে আসতে কার বয়ে গেছে!

রাধানাথদা আমাকে রেখে কোথায় চলে গেলেন। বলে গেলেন ঘুরে আসছেন। ভয়ে ভয়ে বললুম, স্টীমার যদি আসে!

রাধানাথদা বললেন, ঘরই খোলে নি, স্টীমার আসবে -- খেয়েদেয়ে কাজ নেই তোর মত!

তবু রাধানাথদাকে বারণ করলুম। অনুনয় করলুম।

রাধানাথদা বললেন, স্টীমারের ভোঁ শুনলেই এসে পড়ব। তুই এখানে বোস্।

একটা বেঞ্চি পাতা ছিল স্টেশন-ঘরটার সামনে। রোদে-জলে আর কাক-পক্ষীর কল্যাণে চেহারা হয়েছে দেখবার মত। নেহাত অপারগ না হলে কারও বসবার শখ হবে না। স্টীমারের অপেক্ষায় তো নয়ই। গলে ক্ষত না-হওয়া পর্যন্ত বেঞ্চিটা ওখানে থাকবে, নিয়ম রক্ষা।

বসলুম না, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। আমার দেখা জায়গা, কতবার দেখেছি, আবার নতুন করে দেখছি। সামনেই নদীজল হু-হু করে কোথায় চলেছে, ওপারে গাছপালা অনেক দূরে সরে গেছে, এপারে

টিনের চালা দোকানগুলো যেন টিম টিম করছে। পূজোর ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পূজো-পূজো মনে হচ্ছে না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। এক পা দু পা করে যতই এদিক-ওদিক যাই, ঘুরে-ফিরে সেই স্টেশন-ঘরটার কাছে ফিরে আসি। বুড়ি-ছোঁয়া যেন। রাধানাথদার ওপর এত রাগ হচ্ছে! ঠিক গাঁজা খেতে গেছেন! যেন বুঝতে পারি না, ঘুরে আসছেন কোথা থেকে! বাবাকে এবার গিয়ে বলব, রাধানাথদাকে যেন আর কখনও না পাঠান।

চেয়ে চেয়ে আমার চোখ ক্ষয়ে গেল, স্টীমারের টিকির দেখা নেই। ফুলেশ্বরের ওই বাঁকের দিকে নদী এখন জলে জলময় হয়ে একাকার হয়ে গেছে। ধোঁয়া-ধোঁয়া মত। কিছুই বোঝা যায় না।

নদীতে জোয়ারের সময় চরাচর সব কেমন যেন বদলে যায়। ঘাটের মানুষও শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে। কিছু যেন করবার থাকে না, থাকলেও এ সময় যেন নয়।

স্টীমার-ঘাটের সব যেন বোবা হয়ে আছে। মাঝি-মাল্লা লোকজন সব যেন ছুটি নিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার মত কটা কান-ঝোলা পাটনাই ছাগল কেবল নদীঘাটে এঁটো শালপাতা কুড়িয়ে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে শিব-চক্ষু হয়ে মুখ তুলে হুঁ-হুঁ করে পরস্পর কি বলাবলি করছে। কুসুমকলির চায়ের দোকানে জল ফুটে ফুটে মরে যাচ্ছে, দেখবার কেউ নেই। নদীঘাটে রোদ-মাখা বটগাছটা হাত-মুখ নেড়ে আমাকে আর কত ভুলিয়ে রাখবে!

স্টীমারে উঠেও রাধানাথদার সেই কান্ড! ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে আড্ডা মারতে লুকিয়ে পড়লেন দেখতে পেলুম না। কিছুতে চোখের ওপর থাকবেন না, কি যে উনি করেন ভগবান জানেন। যতক্ষণ না স্টীমার ফলতাগঞ্জে পৌঁছচ্ছে আমি এদিক-ওদিক ঘুরতে ফিরতে লাগলুম। দোতলা জাহাজ মানুষে-মালে ছৈ-ছত্রাকার হয়ে আছে -- মনে হবে যেন একটা ছোটখাটো রেল-প্ল্যাটফরম নদীতে ভেসে চলেছে। পা বাড়াবার জায়গা নেই -- কেউ মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছে, কেউ চিৎকার করে ঘরের গল্প করছে, কেউ মোট আগলে এমন করে বসে আছে যেন ওটি বেহাত হলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে, কেউ আবার সংসার পেতে হাত-পা খেলিয়ে বসেছে।

'উর্বশী'র লোয়ার ডেক থার্ড ক্লাস। ওপরতলায় ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাস। রাধানাথদা আমাকে কখনও ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসে নিয়ে যান না বা আসেন না। নীচের ডেকে গাদাগাদি করে বাড়ি যাই আসি। রাধানাথদা বলেন, ওপরে উঠলে নাকি পড়ে যাব নির্ঘাত নদীতে : রেলিং ধরে দাঁড়াবি আর মাথা ঘুরে কখন এক কান্ড করে বসবি! দন্ড দেবে কে! তবু আমি ওপরে উঠে দেখি, ঘোলাজল সাঁতরে জাহাজ চলে তীরের কোল ঘেঁষে, গাছপালা যেন ওঠা-নামা করে, ঢেউ ভাঙে। বেশ লাগে দেখতে। রাধানাথদা এ সব কিছু দেখেন না। চুপি চুপি এক সময় নেমে এসে দেখব হয় ঘুমচ্ছেন, নয়তো কারও সঙ্গে কি সব গল্প করছেন। আমাকে দেখলেই বলবেন, অত ছটফট করছ কেন, এক জায়গায় স্থির হয়ে বোস না।

স্টীমারে বসতে আমার ভাল লাগে না। দেখতেই ভাল লাগে। তার ওপর ডেকের খোলামেলার মধ্যে কী বসে থাকব! যাত্রীদের পুঁটলি-পোঁটলা আঁকড়ে বসে থাকাটা কেমন যেন! জলে আর স্থলে ব্যবস্থা আলাদা! রেলগাড়ি এল স্টেশনে, উঠে পড়লাম, যে-যার জায়গায় বসলুম আবার এক জায়গায় গিয়ে নামলুম। জাহাজে তা নয়, বিশেষ করে এই ডেকের যাত্রীদের -- উঠে ভিড় করে গাদাগাদি হয়ে বসে থাক যেখানে খুশি, তারপর নেমে গিয়ে হাত-পা খেলাও। বসবার নির্দিষ্ট আসন নেই ডেক-প্যাসেঞ্জারের।

আজ আবার পূজোর ভিড়! উর্বশী মর্তের মহামায়া হয়ে গেছে -- কেউ আর বাদ নেই, যে যেখানে ছিল স্টীমার ভর্তি। ওপর নীচ। রাধানাথদা আমাকে এক জায়গায় একটুখানি শতরঞ্চি বিছিয়ে বসতে বলে কোথায় চলে গেলেন ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেলুম না। বসেই আছি, সামনে জাহাজের বয়লার, গরম ভাপ আসছে, একজন খালাসী ক্রমাগত হাতায় করে কয়লা দিচ্ছে। ঠুং-ঠাং, ঘট-ঘট শব্দ হচ্ছে।

বেশীক্ষণ বসতে পারলুম না। মানে, ভাল লাগল না। উঠে হেঁটে দেখতে ইচ্ছে করল। শতরঞ্চি পড়ে রইল পাতা অবস্থায়। রাধানাথদা বুঝবেন।

নলদাঁড়িতে জাহাজ এসে দাঁড়াল, জেটি নেই, ঘাট থেকে লোকজন নৌকো বোঝাই হয়ে জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল। জাহাজের ওপর থেকে খালাসী মোটা কাছি ছুঁড়ে দিলে। নৌকোর মাঝি সেটাকে ধরে নিয়ে নৌকোর গলুইয়ে চটপট গলিয়ে টেনে রইল। নৌকো স্থির হয়ে জাহাজের গায়ে লাগতে যাত্রীরা যে-যার মত চটপট উঠে পড়ল। তারপর কাছি খুলে দিতে নৌকোটা ভেসে গেল ডিগবাজি খেতে খেতে। জাহাজ চললে পিছন ফিরে দেখা যায়, মাঝি হাল ধরে নৌকোটাকে সামনে নিয়ে তীরের দিকে বেয়ে চলেছে, নলদাঁড়ির ঘাটে কেউ কেউ এখনও অপেক্ষা করছে। তীরের গাছপালা ছোট হয়ে ক্রমে বড় হচ্ছে। উলুবেড়ে থেকে ফলতা ষোড়শী-উর্বশী এই ভাবে রোজ যাত্রী তোলে, নামিয়ে দিয়ে যায়। জেটি আছে কেবল ফলতাগঞ্জে, সেই উলুবেড়ের পর। আর আছে গেঁয়োখালিতে। শ্যামগঞ্জ, রাইপুর, নলদাঁড়ি, পীরপুর আরও কত ঘাট নদীর তীরে! এপারে চব্বিশপরগনা, ওপারে হাওড়া। নদীপারে কত ছবি আছে, ছেলেবেলায় দেখেছি, এখন সে-সব ভুলে গেছি।

ভাটার সময় নদীপারে এসে দাঁড়ালে এখনও বোধ হয় সেই সব ডাক শোনা যায়, শান্ত দ্বিপ্রহরে মাঝির একক চিৎকারে তীরভূমি হয়তো মুখরিত হয় : রাইপুর! রাইপুর! শ্যামগঞ্জ! শ্যামগঞ্জ! নলদাঁড়ি! ই-ই-ও!

কালে কালে যাত্রীর অভাবে ষোড়শী-উর্বশী অচল হয়ে গেছে। অকালবার্ধক্যে লোকচক্ষুর আড়ালে সরে গেছে, ফলতাগঞ্জের জেটি কোথায় ভেসে চলে গেছে। দু-একটা ফেরি নৌকো ঘোরাঘুরি করে হয়তো।

দূর থেকে মনে হবে যেন এক ঝাঁক বক দল বেঁধে নদীতীরে জল খেতে নেমেছে। নদীর বাঁকটা ঘুরলেই মনটা দুলে উঠত। কিন্তু ষোড়শী-উর্বশী বড় যেন দেরি করত ওইটুকু পথ অতিক্রম করতে। ফলতা দেখা যায়, সারবন্দী করগেট টিনের চালাগুলো নদীপারে ঝলমল করছে।

অনেকক্ষণ থেকে প্রস্তুত হয়ে আছি। জাহাজ জেটিতে লাগলে এক মিনিটও যেন বিলম্ব না হয়। রাধানাথদাকেও তাড়া দিয়েছি। নিশ্চিন্ত মনে তাস পিটছেন। বললেন, শিবগঞ্জ পেরুক, তার পর --

শিবগঞ্জ এসে গেছে। এইবার --

রাধানাথদা বিরক্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি চুপটি করে বোস। বেশী ছটফট করলে ভিড়ের মধ্যে নামতে পারবে না।

মনে মনে বললুম, উঃ, ফলতায় এসে গেছি, নামতে পারব না! নতুন জায়গা যেন।

স্থির থাকতে পারি নি, কেবল এধার-ওধার করছি, এদিক-ওদিক থেকে জাহাজের গতি লক্ষ্য করছি। শিবগঞ্জের যাত্রীরা উঠল নামল, নৌকো ঘাটে ফিরে গেল।

এবার ফলতামুখে জাহাজ চলেছে সোজা। জল-কাটা পিছনের চাকাটা স্থির হয়ে আছে -- হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে কাটতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে চিৎ-সাঁতার কাটার মত। আর কত দূর ফলতা?

হঠাৎ ডেকের যাত্রীদের মধ্যে হৈ-হৈ হাঁকা-হাঁকি বেধে গেল। বুক আমার উড়ে গেল। কি হল?

ভয়ে ভয়ে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলুম, ডেকের এক ধারে কয়েকজন যাত্রী দল বেঁধে একটি লোককে মারতে উদ্যত হয়েছে, হুংকার আস্ফালন চলছে!

ভিড়ের কাছে সরে এলুম। বেশ বাবু-বাবু একজন সবাইকে বলছে, যাক যাক, মারধোর করে আর কি হবে। আমি বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু তখনও আমি কিছু বুঝতে পারি নি। আমার কৈশোর মস্তিষ্কে কিছু ঢোকে নি। চোর নাকি?

তার পর এক কান্ড হল। ভদ্রলোক হাতের চেটো উল্টে একটা শিশি সবার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন। সেন্টের শিশি।

ভিড়ের উত্তেজিত ভাব কেটে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি?

ভদ্রলোক সেন্টের শিশিটা খুলে ফেললেন। মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল জায়গাটা। নদীর জলে কতক মিশে গেল, হাওয়াতে উড়িয়ে নিলে কিছুটা। আরও গন্ধ বেরুল যখন ভদ্রলোক শিশিটা নিঃশেষ করে সামনে একটা নিরীহ দীনবেশ যুবকের মাথার ওপর ঢেলে দিলেন।

ভদ্রলোক স্মিত-মুখে সবাইকে বললেন, চুরি করবার কিছু দরকার ছিল না, আমার কাছে চাইলে কি আর দিতুম না!

এতক্ষণে বুঝলুম, চোর ওই ভদ্রলোকের সেন্টের শিশি চুরি করেছিল। পুজোর বাজার!

ভদ্রলোক হেসে নিরীহ লোকটার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, এবার হয়েছে -- শখ মিটেছে?

তার পর সেন্টের শিশিটা ছুঁড়ে নদীজলে ফেলে দিলেন

ভিড়ের সবাই বললে, মজার ভদ্রলোক! আমরা হলে লোকটাকে এতক্ষণে হাত-পা বেঁধে জলেই ফেলে দিতুম। গন্ধ মাখার শখ হয়েছে!

সেন্টের গন্ধ মিলিয়ে যেতে জাহাজ এসে ফলতাগঞ্জে ভিড়ল।

ঘাটে উঠে রাধানাথদা আবার সেই পা-ঘষা আরম্ভ করলেন একটু দাঁড়াও, আমি আসছি চট করে।

আর আমি ভয় করি না। রাধানাথদা এখন সংগে না এলে কিছু যায়-আসে না। নিজের ডেরায় এসে গেছি এ আর মামার বাড়ি নয়। ফলতার পথ-ঘাট আমার জানা আছে।

স্টীমার-কোম্পানির স্টেশন পেরিয়ে রাস্তায় এসে পিছন দিকে চাইলুম। বোধ হয় রাধানাথদার জন্যে। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হল। একটু দাঁড়ালুম। আসুন রাধানাথদা তাঁর কাজ সেরে। তাড়া নেই।

যেন লুকোবার জন্যে রাস্তার ধারে আদ্যিকালের তেঁতুল-গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালুম। রাধানাথদা সোজা এলে আমাকে দেখতে পাবেন না। অত বড় গাছটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার আগে আর একটি লোক এসে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়েছে। নদীর দিকে মুখ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একটা পোঁটলা।

গাছতলার ঠিক যে জায়গাটায় লোকটি দাঁড়িয়েছে সেখানে না দাঁড়ালে রাস্তার ওপর থেকে রাধানাথদা আমাকে দেখতে পাবেন। লুকোবার মজা হবে না। লোকটার আর কাজ নেই, আগে-ভাগে ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছে! না, কি ও-ও কারও জন্যে অপেক্ষা করছে? ওরও সংগে কেউ আছে?

মজাটা আমার নষ্ট করে দিলে লোকটা। রাগ হল।

তবু নিজের অধিকার ছাড়ব কেন, আমি ফলতার লোক, তেঁতুলতলার ও-জায়গা আমার।

ছেলেমানুষী জেদে এগিয়ে এসে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লোকটিকে চিনে ফেললুম। স্টীমারের সেই সেন্ট-চোর যুবকটি। থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

সামনাসামনি চোর দেখে ভয়ে-বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলুম। কিছু করতে পারছি না। বাড়ি না গিয়ে লোকটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে কি করছে? লুকোচুরি খেলবার শখ হয়েছে? কার সংগে? না, কাঁদছে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলুম। যেন আমারও দাঁড়াবার দরকার আছে। তেঁতুলতলা কারও একলার নয়!

তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে জামার পকেট হাতড়ে আমার খেলার সাথীদের জন্যে সংগ্রহ-করা জিনিসপত্তর সব বার করে দেখতে লাগলুম। মার্বেল গুলি, লাট্টু লেত্তি, গুলতি জলছবি।

আরও একটা জিনিস একান্ত গোপন করা ছিল। এতখানি পথ সেটাকে কেবল আগলে আগলে বাঁচিয়ে এসেছি। বুকের মধ্যে নিভৃতে রেখেছি।

বুকপকেট থেকে জিনিসটা বার করেই আবার লুকিয়ে রাখতে গিয়ে যেন ধরা পড়ে গেলুম। অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইলুম।

লোকটা কটমট করে আমার জিনিসটাকে লক্ষ্য করছে। যেন তারই জিনিস আমি বেহাত করেছি।

গায়ে পড়ে সেন্টচোর বলল, কাউকে দেবে বুঝি?

ততক্ষণে জিনিসটা পকেটের মধ্যে পুরে ফেলেছি। মাতব্বরী কথার ঢঙে রাগ হল লোকটার ওপর। নাঃ, তোমাকে দেবার জন্যে বার করেছি।

বেহায়া লোকটা বলল, কত দিয়ে কিনেছ সেন্টের শিশিটা?

অত খবরে দরকার কি! কত দিয়ে কোথা থেকে কিনেছি সব খবর চাই! মতলব ভাল নয় নিশ্চয়ই।

রাগ করে বললুম, জানি না।

লোকটা চুপ করে রইল। এতক্ষণ যেন ভুলেই গিয়েছিলুম ঘটনাটা। সেন্টের ওপরই ওর যত লোভ! কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছে ওই এক শিশি সেন্টের জন্যে! সোনা নয়, দানা নয়, চুরি করতে গেল কিনা এক শিশি সেন্ট! শখ মন্দ নয়। একলা পেয়ে আমারটাও যদি কেড়ে নেয় --

তেঁতুলতলাটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি রাস্তায় ওঠবার জন্যে পা বাড়ালুম। চোরের খপ্পরে পড়েছি।

না, লোকটা তেমনি নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য ডুবে গেছে ওপারে।

এত দিন পরে সব কথা মনে নেই। তার পর কি করেছিলুম না-করেছিলুম, কি বলেছিলুম না-বলেছিলুম, কেবল কি ভেবে ফিরে এসে লোকটার হাতে সেন্টের শিশিটা গুঁজে দিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছিলুম, দূর থেকে রাধানাথদাকে দেখে পিছন পিছন ছুটে গিয়েছিলুম : ও রাধানাথদা, দাঁড়াও না, আমি যাব।

ছোটমামীর ক্যাশবাক্স থেকে সেন্টের শিশিটা চুরি করে শেফালীর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলুম। শেফালী নিশ্চয়ই খুশী হত, আমাকে আরও ভালবাসত।

ফোঁটাটা ঠিকমত রুমালে পড়ল না। হাত নড়ে কোথায় পড়ে গেল, ঘরময় গন্ধ!

খুকুর মা কান্ডটি করলেন। ঘরে ঢুকে পিছন থেকে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন যেন বামালশুদ্ধ চোর ধরে ফেলেছেন।

কাজটা পন্ড করে দিয়ে বললেন, বুড়ো বয়সে শখ মন্দ নয়। কোত্থাও এক ফোঁটা সেন্ট লুকিয়ে রাখবার উপায় নেই! তুমিও?

অর্থাৎ সেন্ট চুরির ব্যাপারে আমিও একজন আসামী!

প্রতিবাদ হিসাবে রুমালখানা তাঁর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলুম।

খুকুর মা 'মা গো!' বলে দু পা পিছিয়ে গেলেন।

ফোঁটা-ফেলা সেন্টের গন্ধ ছাপিয়ে ময়লা রুমালের দুর্গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। □

[শ. চি. অগ্রহায়ণ ১৩৬৪]

সি. পি. এম-এ
বসু-বাসবপুন্নিয়া জোট ?

বিশেষ প্রতিনিধি

সি পি এম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বড় ধরনের রদবদলের আভাস পাওয়া গেছে। আসন্ন পার্টি কংগ্রেসেই এই রদবদল হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস বসছে। চলবে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর। পার্টি কংগ্রেসের স্থান নির্বাচন এখনও হয়নি। মনে হয় সল্ট লেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে এই কংগ্রেস হতে পারে।

কিছুদিন আগেই কলকাতায় সি পি এম পলিটব্যুরোর অধিকাংশ সদস্য এসেছিলেন। এসেছিলেন সি পি এম সাধারণ সম্পাদক ই এম এস নামবুদ্রিপাদ ও এম বাসবপুন্নাইয়া। সেই সময় রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী যুবভারতী স্টেডিয়াম দেখিয়ে এনেছিলেন। ওঁরা দেখে সন্তোষ প্রকাশও করেছেন।

এ সবের থেকে বড় কথা পলিটব্যুরোর নেতাদের সঙ্গে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে আগামী কংগ্রেসে পার্টি নেতৃত্ব পরিবর্তনের বোঝাপড়া হয়েছে।

সাধারণত তিন বছর অন্তর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেস আহ্বান করেন। ১৯৮২ সালে বিজয়ওয়াড়াতে দলের একাদশ পার্টি কংগ্রেস বসে। এই হিসাবে ৮৫ সালে পরবর্তী কংগ্রেস বসার কথা।

এখনকার সাধারণ সম্পাদক ই এম এস ১৯৭৬ সালে নির্বাচিত হন। তখন সরে গেলেন সুন্দরাইয়া। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সরে দাঁড়ালেও তখন তিনি পলিটব্যুরোতে ছিলেন। পরে ৮২ সালে পলিটব্যুরো থেকে বাদ পড়েন। স্থান পান কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটিতে। দেখা গিয়েছে দলের পার্টি নীতি ও সাংগঠনিক কাঠামো তৈরিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির চরম বিরোধিতাতেই সুন্দরাইয়াকে সরে যেতে হয়। সরকারিভাবে অবশ্য সুন্দরাইয়ার ভগ্নস্বাস্থ্যই প্রধান কারণ বলে জানানো হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, সি পি এম দলে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রের পার্টিই সব থেকে বড়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই হল বড়। পার্টি ফান্ডের দুই তৃতীয়াংশ যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই কারণেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রভুত্ব বজায় থাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বাড়তি মূলধন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তাঁর ব্যক্তিত্বের ধারে কাছে কেউই প্রায় আসতে পারেন না। যিনি যত বড়ই নেতা হোন না কেন।

প্রমোদ দাশগুপ্ত যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন জ্যোতিবাবুর সমপর্যায়েই ছিলেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রমোদবাবুর প্রভাব ছিল অপরিসীম। সালকিয়া প্লেনামে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কোন পলিটব্যুরো সদস্য কোন রাজ্য কমিটির সম্পাদক থাকতে পারবেন না। প্রমোদবাবু ছিলেন তার জ্বলন্ত ব্যতিক্রম।

এই হিসাবে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে এই দুই নেতার মতামতই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর জ্যোতিবাবু প্রায় সর্বেসর্বা। এখন তো দলের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নেও জ্যোতিবাবুর কথাই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

এই জ্যোতিবাবু ও প্রমোদবাবুর কড়া সমালোচক পার্টির মধ্যে ছিলেন দুজন। একজন হলেন এম বাসবপুন্নাইয়া। দ্বিতীয়জন বি টি রণদিভে। প্রমোদবাবুকে কেন্দ্র করেই এঁদের বিরোধ তীব্র হয়। পার্টি লাইনের থেকেও ব্যক্তিত্বের লড়াই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সঙ্গে তাত্ত্বিক প্রশ্নে সামান্যই বিরোধ ছিল। ৭৭ সালে জনতা সরকারকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির মতপার্থক্য প্রায় তুঙ্গে পৌঁছায়। বাসবপুন্নাইয়া আর বি টি রণদিভে নানা প্রশ্ন তুলে মাঝে মধ্যেই জ্যোতিবাবু আর প্রমোদবাবুকে প্রায়শই বিব্রত করে তুলছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশ্নের ছোঁয়াচ রাজ্য পার্টিতেও ঢেউ তোলে। এসবের মধ্যেই মাঝামাঝি লাইন রেখে চলছিলেন ই এম এস। ৭৬ সালেই সুন্দরাইয়া সরে যাওয়ার পর বাসবপুন্নাইয়া চেষ্টা করেছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক পদ আঁকড়ে ধরার। বিশেষ সফল হননি। পরে এই ব্যাপারটি আর বেশিদূর গড়ায় নি।

৮২ সালে পার্টি কংগ্রেসের সময় বাসবপুন্নাইয়া আবার চেষ্টা করেন সাধারণ সম্পাদক হওয়ার। রণদিভে তাঁকে সমর্থন করছিলেন। জ্যোতিবাবুদের মোটেই সায় ছিল না এতে। শেষমেশ "নিরপেক্ষ" হিসাবে ই এম এস-কেই পার্টি বেছে নেয়।

৭৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দলের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। পার্টি ক্রমশই বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে প্রশাসনের গাড্ডায় পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ওঠে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রায় বন্ধ। আলোচনার টেবিলে সমস্ত সমস্যা সমাধান করার প্রবণতা বাড়ছে। জ্যোতিবাবুদের আরও অস্বস্তিতে ফেলার জন্য বাসবপুন্নাইয়া আর বি টি রণদিভে এই প্রশ্নগুলিকেই ক্রমশ প্রশ্রয় দিতে থাকেন। এরপর প্রমোদবাবু মারা যাওয়ার পর পার্টির মধ্যে নেতৃত্বের বাঁধন আরও শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্ন ক্রমশ ক্ষোভের চেহারা নিতে থাকে। পার্টি ক্ষমতায় থাকার ফলে সুযোগ সুবিধা নেওয়ার লড়াইয়ে ব্যক্তিগত ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে উঠল ৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে। প্রায় দেশ জুড়েই সি পি এমের হল ব্যাপক বিপর্যয়। বাম আন্দোলনের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে পার্টি মার খেল। কেরালাতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।

এইরকম অবস্থায় পার্টির মধ্যে প্রশ্নগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠল। কেবলমাত্র "ইন্দিরা হাওয়া"র কথা সবাই মেনে নিতে পারলেন না। রাজ্য কমিটির সভায় ই এম এস এলেন। পার্টি সরকারে থাকা উচিত কি অনুচিত -- প্রশ্নের ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে নামবুদ্রিপাদ এড়াতে চাইলেন। জ্যোতিবাবুরাও হাওয়া খারাপ দেখে সব প্রশ্ন সাধারণ সম্পাদকের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে নামবুদ্রিপাদ বলে বসলেন, এবারে আমাকে অব্যাহতি দিন। শরীরে পোষাচ্ছে না।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে অবস্থা সামাল দিতে এগিয়ে এলেন বাসবপুন্নাইয়া। তিনি বললেন, সাধারণ সম্পাদকের হয়ত কিছু ত্রুটি আছে, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল পার্টির সরকারে থাকা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তার উত্তর দেওয়া। উত্তর তিনিই দিলেন। একেবারেই জ্যোতিবাবুদের মত করে। ফলে প্রমোদবাবুর অনুপস্থিতিতে জ্যোতি-বাসব গাঁটছড়া বাঁধতে কোন অসুবিধা হল না। সুতরাং আগামী পার্টি কংগ্রেসে ই এম এসকে কেরালার পার্টি সম্পাদক করে বাসবপুন্নাইয়াকে সাধারণ সম্পাদক করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। □

দেখা

অজয় দাশগুপ্ত

দিনটা ছিল শনিবারের বিকেল।

অমল অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তখনো সন্ধ্যে হয়নি। আকাশে ধূসর স্থির একখন্ড মেঘকে স্পর্শ করে কটা পাখি চলে গেল। অমলের মনে হল, সময় এমন করেই চলে যায়। এমনি হঠাৎ, চকিতে।

খতে দেখতে চাকরি জীবনের দশ বছর কেটে গেল অমলের। যৌবনটা গত প্রায়। ঠিক এমন সময়েই ব্যাপারটা ঘটল। অমলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অমল কিছুতেই রাজি হয়নি প্রথমে। বিবাহে তার এই অনীহা অবশ্য অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যর জন্যে নয়। যাই হোক এক ধরনের আলসেমি। জীবন গতানুগতিক চলে যাচ্ছে। না খেতে পেলে যেমন পেট মরে যায় তেমনি জৈবিক ক্ষুধাও অমলের মৃতপ্রায় হয়ে এসেছিল। তাই সে ভেবে নিয়েছিল, অফিস আড্ডা নিয়ে বেশ তো আছি – আবার বিয়ে কেন?

কিন্তু অমলের মা শুনলেন না। তিনি কেঁদেকেটে ছেলেকে রাজি করালেন। মেয়ে দেখার পালা চলল। এই ব্যাপারে বউদিদের উৎসাহের প্রাবল্য প্রচন্ড। তাঁরা একেকটি মেয়ে দেখেন, তার ছবি অমলের সামনে হাজির করে খিলখিল করে হাসেন, অমল মতামত জানানোর আগে নিজেরাই তা নাকচ করে আবার নতুন কোনো মেয়ের সন্ধানে লেগে পড়েন।

অমলের কাছে এটা খুবই বিরক্তিকর। তবু এই বিরক্তি তাকে হজম করতে হচ্ছিল নির্বাক হয়ে। অমল এমনও ভেবেছিল, এইভাবে মেয়ে দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যাবে – বিয়ে আর শেষ পর্যন্ত ঘটবে না।

যা ভাবা যায় তা শেষ পর্যন্ত হয় না। অমলের নৈরাশ্যপীড়িত এই চিন্তাও তাই ফলবতী হল না। পছন্দর মেয়ে পাওয়া গেল বর্ধমানে। বউদিরা সকলে একমত – এবার অমলকে মেয়ে দেখতে বলা হল। বড় বউদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমি নিজে একবার দেখে এস, তারপর কথাবার্তা পাকাপাকি হবে।'

'না না, তার কি দরকার?' অমল বলে উঠেছিল, 'তোমরা সবাই দেখেছ, যথেষ্ট, একজন মেয়েমানুষকে বারবার উল্টে-পাল্টে দেখবার কী আছে? আমার ওসব পোষাবে না।

'না ভাই ঠাকুরপো, যাকে বলে জীবনসঙ্গিনী' –– মেজ বউদি বলে উঠলেন, 'নিজে যাচাই করে নেওয়া ভাল। আর আজকাল তো সব ছেলেই মেয়ে দেখে।'

'কি করে যাচাই করবে মেজদি?' ছোট বউদি মুখ টিপে হাসলেন। 'বিয়ের আগে সব রকম যাচাই-এর রেওয়াজ তো এখনো এদেশে চালু হয়নি।'

'তুই থাম ছোট –' বড় বউদি ধমক দিলেন। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একবার যাও না বাপু বন্ধু বান্ধব সঙ্গে করে, চোখের দেখাটা দেখে এস।'

'কী লাভ তাতে?' অমল তিন বউদির দিকে তাকায়। চেহারা তো ছবিতেই দেখেছি।'

'ছবি আর রক্তমাংসের চেহারা এক নয় ঠাকুরপো –' বড় বউদি বলে উঠলেন, 'ছবি ছবিই, তাতে সব বোঝা যায় না।'

'তোমরা তো বুঝেছ?' অমল বলল।

'সেইজন্যেই তোমাকে বলছি।' মেজ বউদি উত্তর দিলেন।

'আমাকে বলে লাভ নেই।' অমল মাথা ঝাঁকাল, 'ওসব মেয়ে দেখা-টেখা আমাকে দিয়ে হবে না। তোমাদের মতামতই আমার মত।'

'তা হলে এই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আমরা এগোতে পারি?' বড় বউদি অমলের স্বীকৃতি চাইলেন।

'যা খুশি।' অমল মাথা নামিয়ে নিল।

'ঠিক আছে।' বউদিরা চলে গেলেন।

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। অমলের বিয়ের তারিখ পর্যন্ত। আজ শনিবার, আগামী বুধবার বিয়ে। মাঝখানে তিনটি মাত্র দিন। অমল বিয়ের আগে আজই শেষ অফিস করল। পনের দিনের ছুটি নিয়েছে সে।

আজকের সন্ধ্যেটা তাই হালকা লাগছে অমলের। ফাঁকা বাড়িতে একা অমল। বউদিরা সকলে আনন্দ উৎসবের কেনাকাটা করতে গিয়েছেন। ওদের সঙ্গে রয়েছেন ছোড়দা। বড়দা ও মেজদার ফিরতে রাত হবে। মা গিয়েছেন পাড়ার কীর্তনের আসরে। একা অমল একবার রাস্তা একবার আকাশ দেখছে আর ভাবছে ভবিষ্যৎ। তার জীবনের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে কেউ ঢিল ছুঁড়েছে। চিন্তার তরঙ্গের পর তরঙ্গ নতুন বৃত্ত রচনা করে চলেছে।

সন্ধ্যে নেমে এল। রাস্তার বাতি অমলের চোখের সামনে জ্বলে উঠল।

বারান্দার সামনে সামান্য ফাঁকা জায়গা। একটা গন্ধরাজের গাছ রয়েছে। তারপর গেট। বারান্দার আলো ইচ্ছে করে জ্বালেনি। অন্ধকারটা ভাল লাগছে। রাস্তার আলো গেট পর্যন্ত এসে ম্লান হয়ে গেছে। গন্ধরাজ গাছটাকে অদ্ভুত ঝাঁকড়া লাগছে।

অমল এই পরিবেশে স্থিত হয়েছিল। তার দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে।

অমল চমকে উঠল।

একজন যুবতী তাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বাড়ির নম্বর দেখছে। তারপরই গেট খুলে মেয়েটি এগিয়ে আসতে লাগল। অমল উঠে দাঁড়াল চোখে অবাক দৃষ্টি নিয়ে। গন্ধরাজ গাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসে মেয়েটি থামল। অমল আর তার মধ্যে তখনো বেশ খানিকটা ব্যবধান। সে হাত তুলে নমস্কার করল। অমল তাকে চিনতে পারল না। হাত তুলে প্রতি-নমস্কার জানাল।

'এটা কী অশোক রায়ের বাড়ি?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ –' অমল উত্তর দিল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'বর্ধমান থেকে।'

'বর্ধমান থেকে কথাটা শুনেই অমল মেয়েটিকে চিনতে পারল। তার মনে পড়ল, এই মেয়েটির সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হবার কথা। কী আশ্চর্য! বিয়ের কনে বিয়ের আগে ছেলের বাড়িতে না বলে না কয়ে এভাবে চলে এল, কি ব্যাপার!

অমল তোতলা হয়ে গেল। তার কী রকম অস্বাভাবিক লাগছে। মেয়েটির মাথার ঠিক আছে তো! অমল আর কোনো কথা বলে উঠতে পারল না। একটা তোতলামি তাকে পেয়ে বসল।

'আমার নাম ব্রততী।' মেয়েটি কিন্তু সহজ ভাবে বলল। 'অমলবাবু বাড়িতে আছেন – তার সংগেই আমার একটু দরকার ছিল। অনেকদূর থেকে এসেছি।'

'আমার সংগে দরকার?'

'আপনিই অমলবাবু?' ব্রততী এগিয়ে এল।

'হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলুন তো?' অমলের হাড়ে কাঁপুনি ধরল। এমন অভাবনীয় ঘটনা কোনো নাটকেও হয় বলে সে ভাবতে পারল না। আজ বাদে কাল যার বিয়ে, সেই বিয়ের কনে ভাবী স্বামীর সংগে কথা বলতে এসেছে কি কারণে?

'বসতে পারি?' হেসে ব্রততী প্রশ্ন করল। সে বারান্দায় উঠে এসেছে।

অমল নিজের ভুল বুঝতে পারল। একটা আকস্মিকতায় সে সাধারণ সৌজন্যতাটুকুও ভুলে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বসুন।'

বারান্দার অন্য একটা খালি চেয়ারে ব্রততী বসল। তার যে খুব একটা তাড়াহুড়ো আছে দেখে মনে হয় না। চেয়ারের একপাশে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'আমাকে তুমি করেই বলতে পারেন অনায়াসে। দুদিন বাদে তো তাই বলতেন।'

অমল বসে পড়ল।

সে ব্যাপারটা গুছিয়ে উঠতে পারল না। এমন সমস্যায় এর আগে অমল জীবনে পড়েনি। এ কী অসহায় অবস্থা। অমলের পালাতে ইচ্ছে করছিল। ব্যাঙের মতো সে যেন সাপের মুখে ধরা পড়ে গেছে।

'খুব বিব্রত করলাম বোধ হয়।' ব্রততী বলে উঠল। 'জানতাম বিব্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু না এসে পারলাম না।'

'না না -- বিব্রত করবার কি আছে!' যদিও অমল ঘেমে উঠেছে। 'কী ব্যাপার বলুন – ও – হ্যাঁ বলো – মানে তুমি বলাই তো ঠিক হবে?'

ব্রততী খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাসিতে কোনো সংকোচ নেই। সে বলল, 'আপনি কিন্তু ঘাবড়ে গেছেন -- আর আমি যে একটা বেহায়া মেয়ে তাই ভাবছেন।'

'না, সে রকম কিছু ভাবছি না, হ্যাঁ – কি যেন বলবে বলছিলে?' অমল কোনো রকমে কথাগুলো বলে ফেলল।

'আপনার সংগে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল –' ব্রততী শুরু করল।

অমল এবার যেন বুঝতে পারল মেয়েটি কী বলতে এসেছে। যাতে আমি ওকে না বিয়ে করি --

'সে বিয়ে আর হবে না –' ব্রততী কাটা কাটা বলে যাচ্ছে।

অমলের এবার রাগ হল।মনে হল মেয়েটি অতি বাজে! যদি তোমার কিছু ইয়ে-টিয়ে থেকেই থাকে তো আগে জানালে না কেন? লজ্জা! সেই লজ্জার অবরোধ ভেঙে আজ শেষ মুহূর্তে তো ঠিক এসেছ --

'এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।' ব্রততী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

না এমন মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এখন সমস্ত ব্যবস্থার পর উপহাসের পাত্র হব। অসম্ভব! আজকাল ও রকম প্রেম সব মেয়েরই থাকে। বিয়ের জল পড়লে প্রেম পচে যায়। এর বেলায়ও তাই হবে।

'আপনি কী এই বলতে এসেছেন?' অমল নিজেকে স্থির করল। সে আপনি সম্বোধনেই ফিরে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে ব্রততীর দিকে তাকাল। 'বিয়ে হবে না কেন?'

'এই কথাটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য নয় –' ব্রবতী বলতে লাগল। 'যা হবার তা হতই – এ কথা বলবার দরকার ছিল না। বুঝলেন অমলবাবু, আমি বড় দুঃখী মেয়ে -- যাকে দুঃখ দিতে চলেছিলাম তাকে একবার চোখে দেখবার বড়ই বাসনা ছিল, তাই এসে দেখে গেলাম।'

'আমার নিদারুণ সৌভাগ্য দেখছি।' অমল বিদ্রূপ করল।

'সৌভাগ্য কী দুর্ভাগ্য তা জানি না –' ব্রততী বলে উঠল, 'তবে আমি তৃপ্ত হলাম।' হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তারপরই বলল, 'চলি, বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত।' সে যাবার জন্য পা বাড়াল।

অমলের ভীষণ রাগ হল। ইচ্ছে করল টেনে একটা চড় মারে! অমল ক্রোধ দমন করল। কড়া কণ্ঠে বলল, 'শুনুন –'

ব্রততী কিন্তু এই হুংকার শুনল না। সে যেমন চলে যাচ্ছিল, তেমনি এগিয়ে গেল। যেন অমলের চিৎকার শুনতে পায়নি। অমলের রাগ প্রচন্ডতর হল। সে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে দুহাত বাড়িয়ে পেছন থেকে ব্রততীকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

আলো যেমন অক্লেশে পিছলে যায় -- ব্রততী পিছলে গেল। বিহ্বল অমল একরাশ শূন্যতা জড়িয়ে ধরে দেখল তার ধারে কাছে কোনো মানুষ নেই।

বিহ্বলতা থেকে অকস্মাৎ লাফ দিয়ে অমানুষিক একটা ভয় অমলকে ঘুসি মারল। দু-চারবার গোঁ-গোঁ করে অমল মাথা ঘুরে জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরতে সবাই তার কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করল। কৌতূহলভরা প্রশ্ন নিয়ে এক গাদা মানুষ। যা ঘটেছে, তা অমল বলতে পারল না। সে ভাবল ব্যাপারটা সম্পূর্ণই তার মনসিজ -- বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, উল্টে ঠাট্টা করবে। যদিও অমলের সন্দেহ রয়ে গেল সত্যিই ওটা মনগড়া ব্যাপার না অন্য কিছু। আমতা আমতা করে অমল বলল, 'হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল কেন বুঝতে পারিনি।'

সে রাত কাটল। পরদিন দুপুরে অমল স্পষ্ট বুঝল, কাল সন্ধ্যেয় যা ঘটেছে তার চেয়ে বড় বাস্তব আর কিছুই নেই। কিন্তু এমন বাস্তব ব্যাপার যে আজও ঘটে সেটা ভেবে সে শিউরে উঠল। একটা বেদনায়, অসহ্য কান্নায় তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেল।

বেলা দুটো নাগাদ অমলের বড়দার নামে একটা টেলিগ্রাম এল। কী মর্মান্তিক ঘটনা!

টেলিগ্রামে লেখা ছিল : 'বিয়ের ব্যবস্থা বন্ধ রাখুন কাল সন্ধ্যে সাতটায় ব্রততী মারা গেছে। বিশদ খবর পরে জানাচ্ছি।'

টেলিগ্রামটা কাঁপা হাতে নিয়ে অমল সাদা হয়ে গেল। বিবর্ণ! কে যেন মুহূর্তে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিল। তখন রাত ছিল বড় জোর সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা। ব্রততীর কণ্ঠ : 'সে বিয়ে আর হবে না।'

সারাটা দিন অমল গোপনে কাঁদল। ব্রততীর ছবি, ব্রততীর কণ্ঠ তার সংগী হয়ে রইল। মন থেকে একটা চিন্তা কিছুতেই সে তাড়াতে পারল না -- ব্রততী কী তার জন্যই মরল! সেই কী তবে হত্যাকারী!

চিঠি এল মংগলবার। ব্রততীর মৃত্যুর সমস্ত বিবরণ বুকে করে। অমল সেই চিঠি পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার বুক হালকা হল এটুকু জেনে -- ব্রততী আত্মহত্যা করেনি, এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, সে তার আততায়ী নয়।

শুক্রবার রাত থেকে ব্রততীর কলেরা হয়েছিল। এসিয়াটিক কলেরা। শনিবার হাসপাতালে প্রচন্ড চেষ্টার পরও ব্রততী হেরে যায়। সে বাঁচল না। অমলের জন্য বেঁচে উঠল না। অমল এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল -- ব্রততী তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছিল মনে মনে; আর তাই জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে সে অমলকে দেখতে এসেছিল একবার চোখের দেখা -- কথাটা যতই অবিশ্বাস্য হোক অমল একান্তে এইটুকু বুঝতে পারল। অমল এই বোধকে ব্রততী ভেবে আঁকড়ে ধরল। □

লেখকের মৃত্যু

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

(এক)

লেখক অনেক রকম। তবুও তাদের বোধহয় মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা যায়। কেউ প্রাণের তাগিদে লেখে। সে না লিখে পারে না। কেউ পেটের তাগিদে লেখে। তার না লিখে উপায় নেই।

যে প্রাণের তাগিদে লেখে, সে বেশি লেখে না। মাঝে মাঝে যা দু'একটা লেখে, তাতেই হয়ত হই চই পড়ে যায়। যে পেটের তাগিদে লেখে, তাকে রোজ বাজার করার মত, রোজ লিখতে হয়। প্রায় প্রতি ঋতুতে তার যা-হোক একটা বই বের হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের মত এই বইগুলিকে সে শ্রদ্ধা করে না। এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজের উপরও শ্রদ্ধা হারায়।

এই রকম একজন লেখক সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন। কাজ বেশি নয়। দৈনিক ঘণ্টা চারেক আপিসে থাকা। মাসিক মাইনে আপাতত ছয় শো।

অন্য পাঁচটা কাজের মত, এই কাজটিও সরাসরি হয় নি। একজনের মাধ্যমে হয়েছিল। যাঁর মাধ্যমে হয়েছিল, তাঁকে টাকার পরিমাণ সামান্য বাড়াতে বলায় তিনি বলেছিলেন, তোমার এ-কাজটা কাজ নয়, আর মাইনেটাও মাইনে নয়।

তাহলে কি?

তুমি যাতে বেশিক্ষণ না লিখতে পার, সেজন্য তোমাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখা। আর অত না লিখলে যাতে তোমার চলে, সেজন্য তোমাকে কিছু নন-প্র্যাকটিসিং এলাওয়ান্স দেওয়া।

(দুই)

একজন সাধারণ লোকের কথা বলি। সে লেখক হতে চায়নি। তবুও কী মনে হয়েছিল, সে মাঝে মাঝে কিছু লিখেছিল। এবং সেই লেখাগুলি সব বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকেরা সেই লেখাগুলি মনে রাখেনি। সে রেখেছিল। তাই মাঝে মাঝে সে যেমন পুরোনো চিঠিপত্র, তেমনই সেই লেখাগুলি পড়ত। তার মনে হত, একটি ফোঁড়ার চারদিকে কে যেন পরম স্নেহভরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই বেদনা ও আনন্দকে সে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, তার লেখা থেকে বাছাই করে একটি সংকলন গ্রন্থ বের করলে বেশ হয়। এক দুঃসাহসিক মুহূর্তে তার ইচ্ছার কথা সে নিকটতম বন্ধুকে জানিয়েছিল। বন্ধুটি লেখক হিসাবে বহু সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুখে যা বললেন, কাজে সে রকম করলেন না। তাই দরিদ্রের মনোরথ আর একবার হৃদয়ে উত্থিত হয়ে সেখানেই লীন হয়ে গেল।

লোকটি মারা গেলে, যবনিকা দ্রুত কেঁপে উঠল। বন্ধু শ্মশান থেকে ফিরে এক প্রকাশককে ফোন করলেন। বললেন, একটি সংকলন গ্রন্থ এক মাসের মধ্যে বের করতে হবে।

প্রকাশক বললেন, আপনি যখন বলছেন, তখন আর কথা কি। তবে হাতে ক'খানা বই রয়েছে, এত তাড়াতাড়ি বোধহয় পারব না।

প্রতিষ্ঠিত লেখক বললেন, যেমন করে হোক, কাজটা করে দিন। আমার অনুরোধ। অর্ডারও বলতে পারেন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

প্রকাশক বললেন, লেখকের মৃত্যুকে আমরা বইয়ের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে পারব। সে দিক দিয়ে দেরি হয় নি।

কেউ জানল না, সেই অর্বাচীন লেখকের তখন আর একবার মৃত্যু হল।

(তিন)

উপরে দুটি কল্পিত মৃত্যুর কথা লেখা হল। এবার একটি অকল্পনীয় মৃত্যুর কথা বলি। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কথা। তাঁর মৃত্যুর ক'দিন পরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতদিন পরে সেই সভার সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে। শুধু একটি মর্মান্তিক দৃশ্য আজও যায় নি। সেটি তীক্ষ্ণ শলাকার মত বিদ্ধ হয়ে আছে। সভা যখন চলছিল, তখন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দুজন যুবক দুহাতে থান কাপড় ধরে শ্রোতাদের মধ্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। বলা হয়েছিল, মানিকবাবুর পরিবারের আশু সংস্থানের জন্য এর প্রয়োজন ঘটেছিল।

আজ তথাকথিত কৃতী লেখকেরা যখন বিলাস সায়রে নিয়ত ভাসমান, তখন এই দৃশ্যটি আমাদের মনে গভীর বেদনার সঞ্চার করলেও, মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃত শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সেটি হয়ত ছিল একান্ত গৌরবের। □

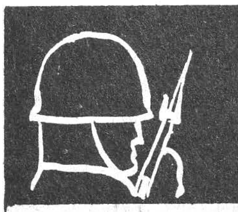

যুদ্ধ ও শান্তি

দীপক বসু

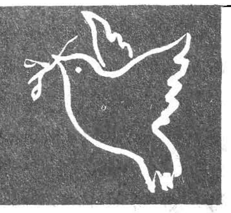

যেহেতু মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মোহ মাৎসর্য -- এই ছয়টি রিপুর দাস, সেইহেতু মানুষের মনের জগতে 'যুদ্ধং'ভাবটা রয়ে গেছে সৃষ্টির সেই আদি যুগ হতে। যে কারণে মানুষ স্বার্থে আঘাত লাগলেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। আর এই তীব্র গর্জন থেকেই বেধে যায় পরস্পরের মধ্যে ধুন্ধুমার কান্ড। শুরু হয় যুদ্ধ। একে অপরকে ক্ষত বিক্ষত করে। একপক্ষের হাত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে অপরপক্ষের রক্তে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে। সে সময় সবল মানুষ দুর্বল মানুষকে আক্রমণ করে তার মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়েছে। তখন এখনকার মত বড় বড় বাড়ী ঘরদোর ছিল না। ছিল না এত সভ্যতার আলো। আদিম মানুষ বাস করত গভীর অরণ্যে। হিংস্র পশুদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষ সংঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করল। শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হোল। ক্রমে মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় আদিম অন্ধকারকে দু'হাতে সরিয়ে সভ্যতার আলোয় প্রবেশ করল। শুরু হোল মানুষের নতুন সমাজ জীবন।

নতুন সমাজ জীবনে প্রবেশ করেও মানুষ ছয়টি রিপুর হাত থেকে রেহাই পেল না। দুর্বলের প্রতি সবলের আক্রমণ যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলতে থাকল। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে সময় কাম্য ছিল যুদ্ধ আবার অপরদিকে শান্তিকামী মানুষেরও অভাব ছিল না। শান্তির দূত শ্রীকৃষ্ণ কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে যাতে যুদ্ধ না বাধে, তার জন্য কি কম চেষ্টা করেছিলেন ? কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন নি। অহংকারে উন্মত্ত দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শান্তির মহাবাণীকে উপেক্ষা করে পান্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে কোন যুদ্ধই মানুষের মঙ্গল করতে পারে না।

যদিও প্রাণী হিসাবে মানুষের জীবনটাই একটা সংগ্রাম — আত্মরক্ষার জন্য ও বংশরক্ষার জন্য সে সর্বদা লড়াই করে চলেছে। জীবন সংগ্রামে সুখ সুবিধা লাভের জন্য মানুষ একত্র হয়ে সমাজ তৈরী করেছে, এবং সেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনেই আপনার পশু প্রবৃত্তিকেও তার সংযত করতে হয়েছে। এরই নাম সুবুদ্ধি। একদিকে এই বৃহৎ কল্যাণবোধ -- সমাজের মঙ্গল, আবার অন্যদিকে সেই জৈব তাড়না -- আত্মরক্ষা, এই দুইয়ের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয়। আর এরই নাম নৈতিক জীবন। এই নৈতিক জীবন যেন কুরুক্ষেত্র -- প্রতিনিয়ত ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম সেখানে চলছে। মানুষের সৃষ্ট ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রামে সব সময় অধর্মের পরাজয় হয়, জয় হয় ধর্মের। স্বার্থপরতা যেখানে প্রকট রূপে দেখা দেয় সেখানেই মানুষে মানুষে বাধে সংঘাত। লোভের বশীভূত হয়ে মানুষ যখন একে অপরকে আক্রমণ করে, এক জাতি অন্যজাতিকে পায়ের তলায় পিষে মারতে চায়, তখনই পৃথিবী কলুষিত হয়। মনুষ্যত্বের হয় চরম অবমাননা। কিন্তু বিধাতার নিয়মে বীভৎস লোভ ও হিংসার কোন স্থান নেই, তা চূর্ণ হবেই। ইতিহাসে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। মহাভারতের দুর্যোধন হিংসা ও লোভের শিকার হয়ে পান্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছিল। ধর্মাবতার যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে মাত্র পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু দুর্যোধন সদর্পে বলেছিল 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র ভূমি'। ফলে বিধাতার নিয়ম অনুযায়ী কুরু পান্ডব যুদ্ধে দুর্যোধন সবংশে নিহত হয়েছিল। জাতি ও দেশের নামে আজ যে সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য জাতিকে বঞ্চিত ও শোষিত করতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাদেরও ধ্বংস অনিবার্য। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী লোভী হিটলার ও সম্রাট নেপোলিয়ন বাহুবল দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তার জন্য তাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ করতে কোন দ্বিধা করেন নি। কিন্তু ইতিহাস কাউকে কখনও ক্ষমা করে না। হিটলার ও নেপোলিয়নের চরম পরাজয়ই তার প্রকৃত প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে সম্রাট অশোকই সর্বপ্রথম ভারতীয় নৃপতি যিনি অনুভব করেছিলেন যুদ্ধ কখনও মানুষকে স্থায়ী শান্তি এনে দিতে পারে না। যুদ্ধ মানেই রক্তক্ষয় -- অশান্তি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানুষকে ভালোবাসাই শান্তির একমাত্র পথ। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সম্রাট অশোক শান্তির জন্য মানুষের সেবা করে গেছেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন -- 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এই পরম সত্যের মহাবাণীকে মনে রেখে প্রত্যেক দেশের মানুষের উচিত যুদ্ধকে পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া। মনে রাখতে হবে জগত জুড়ে শুধু এক জাতি আছে -- 'মানুষ' তার নাম। আসল কথা হোল সকল মানুষই মানুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত। হতে পারে কেউ সাদা চামড়ার বা কালো চামড়ার মানুষ। বর্ণ আলাদা হলেও দেহধর্মে সকল মানুষ এক।

আমাদের সামাজিক সুবিধার জন্য আমরা জাতিভেদ প্রথা রচনা করেছি। আর এজন্যই আমরা কাউকে বলে থাকি স্বজাতি, কাউকে বলি অন্যজাতি। মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা করে আমরা গলাবাজি করে থাকি -- আমার জাতি বড়ো, অপরের জাতি ছোটো। এমনকি, মনে করি, আমার জাতিই প্রভু, রাজত্ব করবে, আর অন্য জাতি শুধুমাত্র দাস -- আমাদের সেবা করবে। এইভাবে উগ্র জাতীয়তার নাম করে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বকেও অস্বীকার করি। জাতি-প্রেমের নামে আমরা মানব প্রেমকেই বিসর্জন দিয়ে বসি। তাতে কিন্তু মানব জীবনে শান্তির বদলে অশান্তির অশুভ ছায়া নেমে আসে। যেহেতু মানুষ প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব সেই হেতু ইচ্ছে করলে মানুষ পারস্পরিক বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে এই পৃথিবীর বুকে চির সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কারণ যে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা মহাকাশে চাঁদের মাটিতে পা রাখতে পেরেছে তার কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই। তাই বুঝি মহাকবি বাল্মীকির কণ্ঠে মহাভারতের মহাবাণী ঘোষিত হয়েছে 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'। অর্থাৎ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই। মানুষ যদি একে অপরকে আত্মীয় বলে মেনে নেয় তাহলে কোন সমস্যাই থাকে না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কিন্তু সকলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন। মহাত্মা যীশুখৃষ্টকে যখন শয়তানের দল ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল তখন রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত যীশু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন "প্রভু ওদের ক্ষমা করো"। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ক্ষমাই হোল মনুষ্যত্বের প্রকৃত ধর্ম। যুদ্ধ মানেই রক্তপাত, মারামারি ও চরম অশান্তি। তাইতো গৌতম বুদ্ধ পরম শান্তির সন্ধানে রাজ সিংহাসন হেলায় ত্যাগ করে, রাজবেশ ছুঁড়ে ফেলে গেরুয়া বস্ত্র পরে ঈশ্বরের সাধনায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি রাজ সিংহাসনে বসে উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন, ভোগে কোন সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ। অবশেষে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি চিরশান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। মানবপ্রেমী বুদ্ধদেব উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন—'অহিংসা পরম ধর্ম'। কারণ হিংসাই মানুষকে রক্তক্ষয়ী সর্বনাশা যুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যতদিন মানুষের মনের মধ্যে হিংসা থাকবে ততদিন পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বাজবে। যেদিন হিংসাকে মানুষ চিরতরে বিসর্জন করবে সেদিনই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ হবে অনির্বচনীয়। ভুল ভ্রান্তিতে ভরা এই সংসার। মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আছে সেই দেব — দানবের চিরন্তন সমুদ্র মন্থন। সে মন্থনে কখনও অমৃতও ওঠে আবার গরলও ওঠে অমৃতের সন্তান হলেও মানুষ হলাহলের তৃষ্ণাতেও নিজের দেবোচিত মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করে। এই তৃষ্ণাকে সে রোধ করতে পারে না, তার মানব প্রকৃতি আপনার অন্তরের পশু প্রকৃতিকেও সম্পূর্ণ বশ করতে পারে না তাই মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের দাবিতেই তাকে আত্মসংযম করতে হয়। সমাজে রাষ্ট্রে সেই পশু প্রবৃত্তিকে শাসন করতে হয়, দণ্ডদান করতে হয়। তা না হলে সমাজ বিন্যাস বিপর্যস্ত হবে, মানুষের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাও ক্ষুন্ন হবে। মনে রাখতে হবে এই দণ্ডদান যেন কোনক্রমেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না হয়। দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য হবে দুষ্কৃতকারীরই আত্মোন্নয়ণ। তার ফলে অপরাধীর মানব চেতনা জাগ্রত হবে। দণ্ডের সংগে তাই প্রয়োজন মমতা, দণ্ডিতের প্রতি সহমর্মিতা, তার প্রতি আত্মীয়তাবোধ — তাতেই বিচারের সার্থকতা। তাই শান্তি কামনায় যতই আমরা আকাশে শ্বেত পারাবত উড়াইনা কেন, সকল মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। সকল মানুষকে আপনার করার জন্যই তো অন্তরে প্রেমের জন্ম। প্রেমের সেই বিশ্বজোড়া সম্পর্কের মধ্যেই মানুষ বাঁধা। মানুষ অপরকে যতই প্রেম বিলোবে, ততই তার মনুষ্যত্বের পূর্ণতা। এই শুভ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ আজ মুখর হয়ে উঠেছে -- 'আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই'। প্রতি বৎসরের মত এবারও ইস্টারের সময় ইউরোপের দেশগুলোতে বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি সংগ্রামের কর্মসূচী প্রবল আকার ধারণ করেছে। কর্মসূচীর একটি বিষয় হচ্ছে মহাবিধ্বংসী নিউক্লিয়র অস্ত্র সজ্জার বিলুপ্তি ঘটানো ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ। সংবাদে প্রকাশ পশ্চিম জার্মানীর দশটি শহরে শান্তি মিছিল সমাবেশে সামিল হয়েছিলেন তিন লক্ষ দশ হাজার নরনারী। এছাড়াও মার্চ মেসের শেষ সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া দ্বীপ মহাদেশে প্রবল শান্তি আন্দোলন ছিল এক নতুন ইতিহাস। ৩১শে মার্চ সে দেশের তিন লক্ষাধিক নরনারী নিউক্লিয়র নিরস্ত্রীকরণের দাবিতে যেসভা সমাবেশ মিছিলের আয়োজন করে তা ছিল অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আন্তরিক অর্থেই অভূতপূর্ব। মেলবোর্নে লক্ষাধিক লোকের মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড। এডিলেড শহরে ১৫ হাজারেরও বেশী নরনারীর মিছিল ও সমাবেশ শান্তি যোদ্ধাদের এক মহান উৎসবে পরিণত হয়েছিল বিখ্যাত গণসংগীত শিল্পী পিটার গ্যারেটের অংশগ্রহণে। সমগ্র ইউরোপ যেখানে শান্তির আন্দোলনে মেতেছে, আসুন আমরাও তাদের সংগে একসুরে বলে উঠি -- আমরা শত্রু চাই না। বন্ধু চাই। সবার সংগে মিলেমিশে। আনন্দেতে বাঁচতে চাই। আমরা সবাই একসুরে মানবতার গান করে সুখের স্বর্গ গড়তে চাই। যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। □

THE STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government of West Bengal Undertaking)

43, Shakespeare Sarani, Calcutta—700 017

IN THE SERVICE OF THE NATION

* Running bheries, freshwater farms and reservoirs for the production of fish.
* Established the biggest brackishwater fish farm at Henry's Island and running 4 others such farms in West Bengal.
* Maintaining a modern Cold Storage & Fish distribution centre at Howrah.
* Supply Fish during festive occasion.
* Exploiting Marine resources through fishing trawlers.
* Having an ideal Fishing Complex for trawler operation and modern well equiped processing unit at Roychowk.
* Sankarpur Fishing Harbour near Digha is under construction.
* Supplies Twine, Nets and Input for fishermen.
* Setting up one modern Net Making plant.
* Preparing various Fish products for domestic and foreign markets.

Solic : Co-operation and continued support.

Kironmoy Nanda,
M.O.S. Fisheries, Govt. of
West Bengal
&
Chairman

লালবাড়ির রহস্য

পুলিশে এখন খুঁটির লড়াই চলছে। যাঁর যত বড় খুঁটি তিনি তত বড় অফিসার। পার্টির দাদাদের ধরবার জন্য হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। বদলি করতে এবং শাস্তি দিতে গেলেই উপর থেকে চাপ আসছে। লালবাজারের প্রশাসন এখন নড়বড়ে বড়তলা থানার জাঁদরেল অফিসার যাঁর বিরুদ্ধে থানার ভিতরেই নারীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল সেই অফিসারকে ছাতায় ঢাকার চেষ্টা করছে। তদন্ত ভেস্তে দেবার জন্য অনেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন। বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি থানার মধ্যে দুই যুবতীর শ্লীলতাহানি করেছেন। এদের ভিতর একজন সি পি এমের স্থানীয় নেতার ভাগ্নি। থানায় রাতের দিকে এসেছিলেন অভিযোগ ডায়েরি করতে। তিনিও রেহাই পাননি এই অফিসারের হাত থেকে। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে অশোভন আচরণ করেন।

With Best Compliments from

East Anglia Plastics Limited (India)

Regd. office & factory
:
145, Jessore Road
Calcutta-700089
Phone : 57-2821(3 lines)

City office :
23, Camac Street,
Calcutta-700016.
Phone : 44-7918/44-3685/44-1383

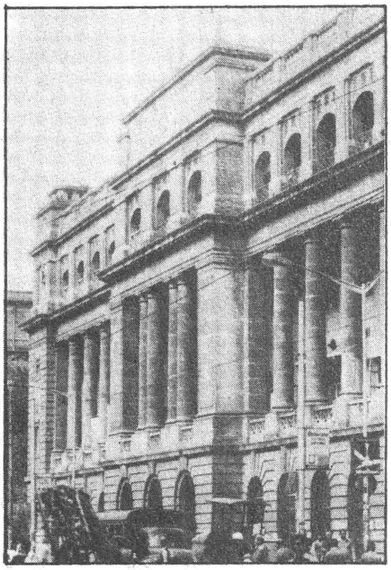

অন্য যুবতীকে তিনি বেশি রাতে ডেকে পাঠান থানায়। সেখানে তিনি তাকে আদর করে বলেন, আমার কাছে চলে এসো। তোমার খাওয়া পড়ার চিন্তা থাকবে না। ভাল ফ্ল্যাটে তোমায় সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেব। তবে আমার দেখভাল তোমাকেই করতে হবে। মেয়েটি এই কথা শুনে আঁতকে উঠেছিল। বলেছিল আমায় ছেড়ে দিন। কেউ দেখে ফেলবে। রাত কাটিয়ে মেয়েটি বাড়ি ফেরে ভোরের দিকে। পুলিশের গাড়িতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই মেয়েটি ডাকাতদের আশ্রয় দিত। তার ঘর থেকে এক ব্যাংক ডাকাত ধরা পড়ে। বড়তলা থানার সেই জাঁদরেল অফিসার জানতেন যে ঐ মেয়েটির ঘর ডাকাতদের ডেরা হয়ে উঠেছে। জানা সত্ত্বেও তিনি কোন ব্যবস্থাই নেন নি। ডাকাত ধরা পড়ার পর ঐ মেয়েটি গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। খবরের কাগজে খবর বার হবার পর টনক নড়ে লালবাজারের। কমিশনার বিকাশকলি বসুর নির্দেশে তদন্ত করেন উত্তরের-ডি সি দুলাল বিশ্বাস। দুলাল বাবু সৎ এবং দক্ষ অফিসার হিসাবে পরিচিত। স্বাধীনচেতা অফিসার তাঁর বাড়ি ও অফিসে গিয়ে ধর্ণা দেন। কিন্তু বশে আনতে পারেন নি। এখন মেয়েটির উপর থানার সেই অফিসার নানা ভাবে প্রভাব খাটাচ্ছেন। তারই উপর চলছে নজরদারি। শাদা পোশাকের পুলিশ বসিয়ে রাখা হয়েছে তার ঘরের সামনে যাতে বেফাঁস কিছু সে বলতে না পারে। তবুও মেয়েটি থানার নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছে। ঐ অফিসার তার মানহানি কী করে করেছে তাও সে জানিয়েছে। থানার সিপাইরাও ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। মেয়েটির অবমাননার কথা তারাও স্বীকার করেছে। গোপন ঘটনা বেঁফাস হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত ভেস্তে গেল। কারণ তাঁর পেছনে রয়েছেন সি পি এমের এক জাঁদরেল নেতা এবং এক ডি আই জি। সি পি এমের লক্ষ্মী সেন এই অফিসারকে সব সময় আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে চলেছেন। লক্ষ্মী সেনের ছেলে কীর্তিমান। মস্তানিতে ওস্তাদ। ওয়াগন ভাঙ্গার দলের সঙ্গে তার যোগসাজস রয়েছে। শ্যামপুকুর, বড়তলা, কাশীপুর, চিৎপুর এলাকায় তার কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত। এইসব জায়গায় কাজ করতে হলে এই সব থানার বড়বাবু এবং অফিসারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করলে চলে কি করে? তাই বড়তলার সেই জাঁদরেল অফিসারকে মদত না দিলে সাম্রাজ্য ধসে যাবে।

লক্ষ্মী বাবুরা তাঁকে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তবে সি পি এমের একটি অংশ এই অফিসারের শাস্তি চায়। তাঁরা চান অন্তত কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তাঁকে বদলি করা হোক। এ দাবি দীর্ঘ দিনের। লক্ষ্মীবাবুর সমর্থকরা তা মানতে চাইছেন না। মুখ্যমন্ত্রীকেও তাঁরা ভুল বোঝাচ্ছেন। খবরের কাগজে বড়তলা থানার কেলেঙ্কারির কথা বার হবার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রিপোর্ট তলব করেছিলেন। লক্ষ্মীবাবুরা তাঁকে বুঝিয়েছেন, ও কিছু নয়। ওটা কংগ্রেসীদের কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছু নয়। সি পি এম থেকে এই ঘটনার উপর রাজনৈতিক রঙ চড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। ওঁরা বলছেন পৌর নির্বাচনের মুখে এই সব কুৎসা রটিয়ে সি পি এমকে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এদিকে বড়তলার ঐ বড় অফিসার লালবাজারে যুগ্মকমিশনার (সাধারণ) বীরেন্দ্র কুমার সাহার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, বলেছেন আমায় বাঁচান, স্যার। আমাকে তো সবারই দরকার হয়। এই বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করুন স্যার।

বীরেনবাবু তাঁকে নাকি অভয় দিয়েছেন। তাঁর হস্তক্ষেপে এই তদন্ত ভেস্তে যেতে বসেছে। বড়তলার বড় অফিসারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে সেসব তিনি বিশ্বাস করতে চান না। ঐ অফিসার তাঁর আস্থাভাজন।

বীরেন বাবু রিপোর্টারদের বলেছেন, ওর বিরুদ্ধে কোন নালিশ কেউ লিখিত ভাবে করে নি। তাই তদন্তের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু কমিশনার বিকাশকলি বসু এবং উত্তর তল্লাটের ডিসি দুলাল বিশ্বাস অত সহজে ছাড়তে রাজি নন। কারণ তাঁরা জানেন নির্যাতীত মেয়েটির নালিশ টেপ রেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছে। বীরেনবাবু হয়তো তা জানেন না। □

কমল

সোলাঙ্কির অপসারণ

সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় জর্জরিত অশান্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিং সোলাঙ্কি দিল্লী সফর করে রাজ্যে বীরদর্পে ফিরে এলেও তার রাজত্বের কাল আর বেশি দিন স্থায়ী হল না। সম্প্রতি হাইকমান্ড গুজরাটে কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক মুপানার নেতৃত্বে যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট দল পাঠিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে এক বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেছেন।

এই পর্যবেক্ষক দলটি দফায় দফায় রাজ্যের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে গুজরাটের সাম্প্রতিক বিস্ফোরক পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে হলে অবিলম্বে একটা সর্বজনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

সোলাঙ্কির সমর্থক ছাড়া এই পর্যবেক্ষক দল যাদের সঙ্গেই কথা বলেছেন তারা সকলেই একবাক্যে সোলাঙ্কির অপসারণের দাবি জানিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছিল যে অবস্থা স্বাভাবিক করতে গুজরাটে স্বল্পকালের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা সমীচীন হবে, না সর্বজন স্বীকৃত কোন নতুন নেতা বেছে নেওয়া হবে। জানা গেছে যে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস গোষ্ঠী সহ রাজ্যের সকল গোষ্ঠীই নাকি নতুন নেতৃত্বের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নতুন নেতা হিসাবে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সনত মেহতা, রণজিৎ সিং গায়কোয়াড় অথবা নটবরলাল সাহের নাম প্রস্তাব করেছেন। সোলাঙ্কি গোষ্ঠী এখনও রণে ভঙ্গ না দিলেও বুঝতে পারছে যে অবস্থা সুবিধার নয় তাই শেষ মেশ সোলাঙ্কির বিদায় অবশ্যম্ভাবী হলে বিকল্প হিসাবে পর্যবেক্ষক দলকে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান মহান্ত বিজয় দাসজী এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমর সিং চৌধুরীর মধ্যে কাউকে সোলাঙ্কির স্থলাভিষিক্ত করবার প্রস্তাব রেখেছিলেন

সোলাঙ্কির তিন তিন বার মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে কোন সময়েই খুব একটা সুখে কাটেনি। দলীয় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বারবার তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লীতে দরবার করেছে। কিন্তু সোলাঙ্কি সুকৌশলে দিল্লিকে খুশী রেখে তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর চোখা চোখা বাণকে ভোঁতা করে দিতে সমর্থ হয়েছেন প্রতিবারই কিন্তু সঠিক আত্মপ্রত্যয় থেকে মানুষ অন্ধ হয়ে পড়ে। কেবল চালাকির দ্বারা সব সময়ে যে সব কাজ উদ্ধার করা হয় না তা সম্ভবত তিনি এবার বুঝতে পারেন নি।

নির্বাচনের আগে সোলাঙ্কির নতুন সংরক্ষণ নীতির ঘোষণার পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্যটি যে ছিল ভোট প্রাপ্তি তা আর পরে গোপন রাখা সম্ভব হয় নি। সোলাঙ্কি সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলার নামে পুলিশ ও প্রশাসনকে নিজের স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পুলিশ এবং গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন করতে সাফল্যলাভ করেন নি। নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে গুজরাটে তিনি একে একে দলের বিরোধী গোষ্ঠীর প্রায় সকলকে কৌশলে নির্বাসন দিতে সমর্থ হয়েছেন। সংকীর্ণ জাতপাতের রাজনীতি করে তিনি কংগ্রেসের ভাবমূর্তি ম্লান করেদিয়েছেন গুজরাটে। যে যুব সমাজ গুজরাটে কংগ্রেসের পতাকা তলে দলে দলে সমবেত হয়েছিল তারা আজ লড়াইয়ের ময়দানে। এক কথায় নিজের কৃতকর্মের ফলে সোলাঙ্কি গুজরাটে কংগ্রেসের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

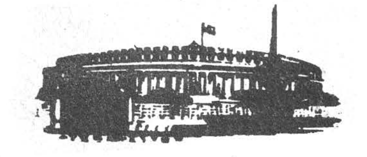

অমৃত কুমার

দক্ষিণ গুজরাটের কংগ্রেসের প্রভাবশালী আদিবাসী নেতা জিনাভাই দরজি এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সনত মেহতাই শুধু নয়–সোলাঙ্কির খুব কাছের লোক বলে পরিচিত সংসদ সদস্য নরসিং মাকোয়ানা চিমন মেহতা এবং ঈরশাদ মিরজাও এখন তাঁর বিপক্ষে। আমেদাবাদ এবং অন্যান্য শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় কংগ্রেসের অনেক মুসলমান নেতা যারা এক সময়ে সোলাঙ্কির ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরাও এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যসভার সদস্য রউফ ভলিউল্লা তো সম্প্রতি দিল্লিতে সোলাঙ্কির অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। উচ্চবর্ণের কংগ্রেস এম এল এদের বেশির ভাগই এখন সোলাঙ্কি হটাও দাবি তুলেছিলেন।

সোলাঙ্কি যখন বুঝতে পারলেন যে পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যেতে আরম্ভ করেছে তখন যে সংকীর্ণ জাতপাতের রাজনীতিকে খুঁটি করে তিনি রাজনীতির পাশা খেলায় কিস্তি মাত করে আসছিলেন সেই বড়িয়া-ক্ষত্রীর রাজনীতির রক্ষা কবচকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা এবারে বুমেরাং হয়ে তাঁকে প্রত্যাঘাত করতে উদ্যত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বরোদা জেলায় সোলাঙ্কির

রাজধানীর চিঠি

সমর্থকদের দ্বারা আয়োজিত এক ক্ষত্রীয় সম্মেলনে খুব কড়া ভাষায় প্রকাশ্যে ঘোষাণা করা হয়েছে যে সোলাঙ্কির অপসারণ ঘটালে গুজরাটে যে এক ব্যাপক জাতপাতের লড়াই সুরু হয়ে যাবে। বস্তুত পক্ষে যে ফলশ্রুতিতে ২/১ টি গ্রামাঞ্চলে জাতপাতের লড়াই সুরুও হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত সোলাঙ্কির স্বপক্ষে সমর্থন জোগাড় করবার জন্যে সম্প্রতি ব্রহ্ম প্রকাশ এবং রামবিলাস পাশোয়ান সহ বিরোধীদের একটি দলকে গুজরাটে নিয়ে আসা হয়। বক্তারা প্রকাশ্যে জনসভায় সোলাঙ্কিকে পূর্ণ সমর্থন জানালেও রাজীব গান্ধীর সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে ওঠেনা। হাই কমান্ডের পাঁচ পর্যবেক্ষক এই ঘটনায়খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তা দিল্লির নজরেও এনেছেন।

এত ঘটনার পরও সোলাঙ্কি প্রথমে পুরো হাল ছাড়েন নি। শেষ অস্ত্র হিসাবে তার সমর্থক দিয়ে বিধান সভার কংগ্রেস সদস্যদের কাছে হুমকি দিয়েছিলেন যে, নেতৃত্বের বদল করা হলে তিনি রাজ্যপালের কাছে বিধানসভা ভেঙে দেবার প্রস্তাব করবেন। এত করেও শেষমেশ সোলাঙ্কি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

গুজরাটের সাম্প্রতিক অবস্থার জন্য মূলত সোলাঙ্কি দায়ী হলেও নির্বাচনের আগে গুজরাট কংগ্রেসের আস্তাবল সাফাইয়ের কাজে কংগ্রেস হাইকমান্ড রাজ্যের ক্ষমতা সমীকরণ পদ্ধতির মূল ধাঁচটি সম্ভবত ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। সোলাঙ্কি এবং তাঁর সমর্থকদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অবহেলিত হয়েছে গুজরাটের প্রভাবশালী পাতিদার গোষ্ঠী উচ্চবর্ণের গোষ্ঠী এবং অপেক্ষাকৃতভাবে জিনাভাই দরজির গোষ্ঠী। প্রাধান্য পেয়েছে নিম্নবর্ণের ক্ষত্রীয় গোষ্ঠী। প্রাক্তন স্বরাষ্টমন্ত্রী প্রবোধ রাওলকে 'সন্দেহজনক চরিত্র' বলে টিকিট দেওয়া হল না অথচ পরমুহূর্তে তাকেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী ম্যানেজার করে দেওয়া হল। সোলাঙ্কিকে খুশি করার জন্য সনত মেহতাকে বাদ দেওয়া হলো। এই সব পরস্পরবিরোধী নানা ঘটনাক্রমে গুজরাটের রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলতে লাগলো।

জল অনেক ঘোলা হয়েছে। গত কয়েক মাসে প্রায় ২০০ জনের মত লোক প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের সংখ্যা প্রচুর। পুলিশ ও প্রশাসন জনগণের আস্থা হারিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত সোলাঙ্কিকে যেতে হল। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন অমর সিং চৌধুরী। □

বিনোদন

মিলন তিথি

সুখেন দাসের আগের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'মিলন তিথি' দেখতে বসলে আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন। কেননা এ ছবিটি সুখেনবাবুর ঘরানার ছবিগুলোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। 'মিলন তিথি' কিশোর প্রেমের ছবি। এ বিষয়টি নিয়ে বাংলায় খুব একটা বেশি ছবি হয় নি। সুখেনবাবু যে অন্য ধরণের কোন ছবি করার চেষ্টা করেছেন, চর্বিত চর্বণ না করে, তাতে তাকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে।

মূল কাহিনীকার হিসেবে সুখেনবাবুর নাম থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না ইংরাজি 'লাভ স্টোরি' কাহিনীটির বাংলা রূপান্তর তিনি করেছেন। বস্তুত বোম্বেতে 'টিন এজ লাভ' নিয়ে যে ছবি করার ধুম পড়েছিল, তার মূলে ছিল ঐ ছবিটি। এই ছবিতে সুখেন দাস দেশজ জিনিষের দিকে না তাকিয়ে, একেবারে মূল বিদেশী কাহিনী অনুসরণ করেছেন। তবে হুবহু অনুকরণ করলে আমরা হয়ত একটা পরিষ্কার ছবি দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারতাম। তা হলো না মূলত সুখেনবাবু নিজস্ব কিছু চিন্তা, কাহিনীর মধ্যে ঢোকানোর জন্য। যেমন, মিলন ও তিথির পিতা-মাতাদের ঘিরে এক ত্রিকোণ প্রেমের উপকাহিনী,

মিলন তিথি' ছবিতে জয় ব্যানার্জী ও পিয়া

ইনজেকশন দিয়ে রুগী মেরে ফেলা বা মার্সি কিলিং এবং সবশেষে মিলনের ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা -- এসবই ছবিটা কাব্যিক মেজাজটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া সুখেনবাবুর অতিনাটকীয়তার প্রবণতাও ছবিটার ক্ষতি করেছে। সেইজন্য নায়িকার ক্যানসার হয়েছে এ সংবাদে দর্শকেরা আলোড়িত হয় না। মিলনের দুঃখ বা সাহসিকতাও ঐ একই কারণে চাপা পড়ে যায়। অথচ বিষয়টি নিয়ে ভালো ছবি করা যেত। ছবিতে দু'চারটে মন কাড়া দৃশ্য যে নেই তা নয়, তবে কিছুই দাগ কাটে না ঐ চড়া সুরের জন্য। নায়ক-নায়িকার কিছু অন্তরংগ দৃশ্য ছবিতে দেখা গেছে, কখনো-কখনো তা মাত্রাও ছাড়িয়েছে। যদিও ঐ সব দৃশ্যে জয় ব্যানার্জি ও পিয়া খুব স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে জয় ব্যানার্জি অনবদ্য। এ নায়কটির সম্পর্কে আশাবাদি হওয়া যায়। সুমিত্রা মুখার্জি, স্বরূপ দত্ত, অরুণ মুখার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি হয়েছেন ব্যর্থ চিত্রনাট্যের শিকার। সম্পাদনা ও চিত্রগ্রহণ মাঝারি মাপের। অজয় দাসের সুরে গানগুলো মন্দ নয়।

এ ছবি দেখে দর্শকেরা একটি বিতর্কের বিষয় পেতে পারেন। বিষয়টি হলো, ব্যর্থতা কার বেশি, পরিচালক সুখেন দাস, কাহিনীকার সুখেন দাস না অভিনেতা সুখেন দাসের? □

ভাস্কর চৌধুরী

মুখোমুখি
মুনমুন সেন

মুনমুন সেন এ নামটির মধ্যেই যেন একটা চমক কাজ করে থাকে। নচেৎ বছর চারেক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজো ওর আকর্ষণ কমে নি এতটুকু। প্রথমদিন ওকে যেমন দেখেছিলাম, আজো ঠিক সেইরকমই দেখছি। সেই আগের মতনই মিশুকে এবং জমাটি রয়েছেন উনি পিনাকী চৌধুরী পরিচালিত 'আপন ঘরে' ছবির ভাসার আউটডোরে অনেকদিন পরে দেখা হলো মুনমুনের সংগে। উপস্থিত সাংবাদিক সকলের সংগে বড় অল্প সময়ের মধ্যেই গল্পে মেতে উঠলেন উনি। অদূরে বসে ওঁর স্বামী ভরত। দুই কন্যা মাঠে ছোটাছুটি করছে। তাদের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে রাখতে মুনমুন কথা বলছিলেন। এক ফাঁকে আমি ওঁর সংগে কয়েকটা কথা বলে নিলাম। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে মুনমুন স্পষ্ট উত্তর দিলেন।

ঃ আপনার হাতে এখন বাংলা ছবি কি কি?

মুনমুন ঃ নিশিতৃষ্ণা আর এই আপন ঘরে। নিশিতৃষ্ণা শেষ পর্যায়ে, আপন ঘরে এই শুরু হলো। ও হ্যাঁ, অন্তরালে বলে আরেকটা ছবি আছে।

ঃ বাংলায় তো নায়িকার অভাব, আপনি আরো বাংলা ছবি করছেন না কেন?

মুনমুন ঃ কেউ নিচ্ছে না যে। এই দেখুন না, রথীন মজুমদার প্রযোজিত 'আশীর্বাদ'-এ আমি কাজ করবো এটা ফাইন্যাল। সেইমত আমি তৈরিও হয়েছিলাম মেন্টালি। কিন্ত নানান ঝামেলায় আমি দুটো ডেট অ্যাডজাস্ট করতে পারলাম না। ব্যাস, বাদ হয়ে গেলাম।

ঃ কি জাতীয় রোল আপনি পছন্দ করেন?

মুনমুন ঃ সবরকমের চরিত্রই। বিশেষ কোন চরিত্রের উপর আমার কোন ফ্যাসিনেশন নেই।

হিন্দি না বাংলা কোন ভাষার ছবি আপনাকে বেশি টানে?

মুনমুন ঃ টাকার দিক থেকে হিন্দি আর মেন্টাল দিক থেকে বাংলা।

ঃ সুচিত্রা সেনের মেয়ে বলে আপনি কি বাড়তি কোন সুবিধা পান?

মুনমুন ঃ নিশ্চয়ই, বড় সহজেই আমি পাঁচজনের কাছে পরিচিত হতে পেরেছি। সেটা নতুন কোন নায়িকার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে এর জন্য আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি। সকলেই আমার কাছে দারুণ কিছু একটা আশা করে থাকে। যেটা অন্য কোন নতুন নায়িকার কাছে করে না।

আমাদের কথার ছেদ পড়লো পরিচালক পিনাকী চৌধুরী মুনমুনকে স্যুটিং-এ অংশ নিতে ডাকার জন্য। ওদিন মুনমুনের সহশিল্পী ছিলেন প্রসেনজিৎ। পরিচালক পিনাকীবাবু ওদিন একটি গানের পিকচারাইজেশন ও কয়েকটি রোমান্টিক দৃশ্য চিত্রায়িত করলেন। 'চেনা অচেনা' খ্যাত এ মানুষটিকে এককথায় কাজ পাগল পরিচালক বলা যায়। কাজের বেলায় ভদ্রলোক কোন সহাবস্থানে মোটেই বিশ্বাসী নন। যতক্ষণ না মনের মত হয়, ততক্ষণ শর্টের জন্য পরিশ্রম করে যেতে উনি মোটেই পিছোন না। তপন দত্ত নিবেদিত, স্নিগ্ধা দত্ত প্রযোজিত সুনন্দা চৌধুরী রচিত ও চিত্রনাট্যায়িত রাজর্ষি চিত্রমের এ ছবির অন্যান্য শিল্পীরা হলেন, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, দেবীকা মিত্র, মৃণাল মুখার্জি,

কল্যাণী মণ্ডল, ছায়া দেবী ও সুমিত্রা মুখার্জি। মৃণাল ব্যানার্জি হলেন ছবির সুরকার।

সম্প্রতি স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে পরিচালক সুরজিৎ চৌধুরী 'ক্ষমা' ছবির কাজ শুরু করেছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। দিলীপ রায় সুরারোপিত এ ছবির প্রথম পর্বের দৃশ্যগ্রহণে অংশ নেন, বিপ্লব চ্যাটার্জি, ছন্দা দেবী, দেবযানী, রবি ঘোষ ও শ্যামল রায়চৌধুরী।

গত উল্টোরথের দিন বিকালে রাসবিহারী এভিনিউর রথের মেলাতে অঞ্জন মুখার্জি পরিচালিত গোপা রায়চৌধুরী প্রযোজিত আর. আর. প্রোডাকসন্সের নতুন রঙিন ছবি 'বংশধর'-এর শুভসূচনা হলো। মহরৎ শর্টের ক্ল্যাপস্টিক দিলেন ছবির কাহিনী ও

ছবি : সৌমেন বরাট

মুনমুন সেন

চিত্রনাট্যকার অঞ্জন চৌধুরী। প্রধান চরিত্রে আছেন রঞ্জিত মল্লিক। চিত্রগ্রহণে আছেন পান্তু নাগ। মৃণাল ব্যানার্জি সুরারোপিত এ ছবির ধারাবাহিক দৃশ্যগ্রহণের কাজ খুব শীগগিরই শুরু হবে।

রত্না ফিল্ম কর্পোরেশনের রঙিন ছবি 'প্রণামী'র দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। এ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন অঞ্জন চৌধুরী। অনুপ সেনগুপ্ত পরিচালিত এ ছবির শিল্পীরা হলেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সুমিত্রা মুখার্জি, দেবশ্রী রায়, শকুন্তলা বড়ুয়া, শৌভিক ও রঞ্জিত মল্লিক। □

তপন রায়

নববাণীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সম্প্রতি হাওড়া নববাণী বালক সংঘের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২দিন ব্যাপি উদ্‌যাপিত হল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের শুরু অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সব আনন্দে জাগো' রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে। এর পরে সংঘের তরফ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুণিজন সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বাংলার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক শ্রী গোপাল চট্টোপাধ্যায় পুরাতনী দিনের গান ও টপ্পা পরিবেশন করেন। এছাড়া পঙ্কজ সরকারের চারটি নজরুল গীতির মধ্যে "শাওন রাতে যদি" গানটি যেন তাঁর গলায় ম্লান লাগছিল। গানটিতে তিনি তাল ও লয় ছেড়ে কেন বেরিয়ে গেলেন বোঝা গেল না।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে "ছন্দসুর" কর্তৃক নাচে ও গানে প্রাদেশিক লোকগীতির মধ্যে "প্রথম আদি শক্তি" ও "ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম" গান দুটি মনে রাখার মত। তাঁরা মোট নৃত্য সহ ১৮টি গান পরিবেশন করেন। নৃত্যে সোমা ঘোষ ও ডালিয়া বসু যথাযথ। কিন্তু গানে অমিত ঘোষের সাধনার প্রয়োজন। তার একটা দোষ যেটা বেশী মাত্রায় ধরা পড়েছে সেটি হল ওপরের দিকে সপ্তকে গলা একদম বেমানান। অমিত চক্রবর্তীর ভবিষ্যত ভালো। তবলায় অরুণ পাল যোগ্য।

দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠানে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নববাণী সংস্থা উপস্থিত করেছিলেন কয়েকজন নবীন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন শিল্পীকে। এই নবীনাদের মধ্যে মৌসুমী হাজরা শ্রোতাদের স্পর্শ করতে পেরেছে। নৃত্যে আবিরা মুখার্জী শিশু শিল্পী হলেও ভবিষ্যত যে তার উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সবশেষে "বান্ধব সম্মিলনী" কর্তৃক মুন্সী প্রেমচাঁদের কাহিনী অবলম্বনে সদ্‌গতি নাটকটি একটি নিটোল উপহার। নির্দেশক শক্তি চট্টোপাধ্যায় নাটককে সাজাতে গিয়ে কখনও নাটককে আবেগ ক্লিষ্ট অথবা তত্ত্ব ভারাক্রান্ত করেন নি। অভিনয়ের দিকেই জোর দিয়েছেন বেশী। এর জন্য নির্দেশককে ধন্যবাদ। আরো ভালো লাগে কাজটি করলেন শিক্ষার্থীরা। ভবিষ্যত আশাপ্রদ। অভিনয়ে প্রত্যেকেই গভীর অথচ সাবলীল। আশুতোষ পণ্ডিত, ভোলানাথ হাজরা, রামমোহন পণ্ডিত, স্বপ্না পাত্র ও মধুসূদন পণ্ডিত প্রত্যেকেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন। আলো যথাযথ। কিন্তু ভাষ্যকার অচিন্ত্য গাঙ্গুলী অনর্থক মাউথ পিস্ নিয়ে টানাটানি করেছেন যেটা না করলেই ভালো হত। সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর ও সার্থক রূপ দান করেন নির্মল চট্টোপাধ্যায়।□

কমল চট্টোপাধ্যায়■অরুণ সাঁতরা

কলকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মর্মর মূর্তি স্থাপিত হবে

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতি ও এশিয়াটিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে গত ৬ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ৮৫তম জন্মদিবস পালন করা হয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, এম পি। প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী, শ্রী প্রভাকর ম্যাচাওয়ে, ডাঃ ভাই মহাবীর এবং শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী প্রমুখেরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন সোসাইটির সম্পাদক শ্রী চন্দন রায়চৌধুরী।

বক্তারা সকলেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর

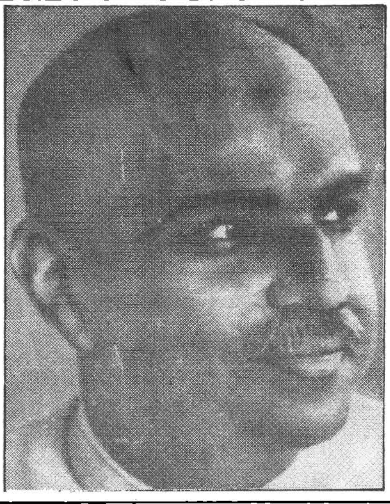

তেজস্বিতা, স্বাদেশিকতার প্রশংসা করে বলেন, বর্তমানে এইরকম দুর্লভ চরিত্রের বড় অভাব। প্রত্যেকেই ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে আগামী বছর জুলাই মাসে এই জন্মদিবসেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি কলকাতায় স্থাপিত হবে। এই বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সমিতির পক্ষ থেকে এই মহাজীবনের আদর্শকে রূপায়িত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।□

■ ■ ■ ■

পুস্তক পরিচয়

লেনিন অপেরার অর্কেস্ট্রা। সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। মূল্য – আট টাকা।

মোট দশটি ছোট গল্পের সংকলন। দশটি গল্পই এক সুরে লেখা। অথচ অর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন সুরের মূর্ছনা অবশ্যম্ভাবী। যদিও বিভিন্ন সুরের মধ্যে হারমোনি থাকা চাই। নইলে, ওটা শুধুই কোলাহল। অবশ্য একই সুরের দশটি গল্পের সংকলনে কোন বাধা নেই। কিন্তু অপেরার অর্কেস্ট্রায় ওটা খুব বাঞ্ছিত নয়।

বিশেষ একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা এবং লেখা এই গল্পগুলো একশ্রেণীর পাঠকের কাছে ভালো লাগতে পারে। মনে হয় সাধারণের জন্য এগুলো লেখা হয়নি। অতএব, সাধারণ পাঠক এর কোন রস গ্রহণে সক্ষম না-ও হতে পারেন। লেখক নিজেও বোধকরি সেরকম অ-মার্কসবাদী পাঠক পছন্দ করেন না। তা না করুন। কিন্তু তিনি বইয়ের টাইটেল পেজে শিরোনামের ওপরে শিরোপার মত বেশ জ্বলজ্বলে অক্ষরে "আন্তর্জাতিক ছোট গল্পের বই" বিশেষ অভিধা জুড়ে দিলেন কেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। গল্পগুলোর আবেদন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমান আদরের অথবা ওগুলো আন্তর্জাতিক ছোটগল্পের সম মানের, কোনটির ইঙ্গিত লেখক দিচ্ছেন, বোঝা গেল না।

আসলে, আন্তর্জাতিক গল্পই হোক আর জাতীয় গল্পই হোক, তাকে প্রথমত এবং প্রধানত গল্প হতে হবে। তা না হলে তো সব বৃথা।

এ সংকলনের কোন একটি গল্পও ঠিক গল্প হয়ে ওঠেনি। কিংবা আমরা একথাও বলতে পারি, গল্প হয়ে ওঠার মুহূর্তে তা বাধা পেয়েছে। যেমন, 'আসামী' গল্পে অর্ধভুক্ত কারখানা শ্রমিক হরদয়াল সপরিবারে ব্রীজ দিয়ে যেতে যেতে তার তিন বছরের হাবা কালো কুৎসিত মেয়েটাকে টপ করে গঙ্গায় ফেলে দিল এবং তারপর তার মনে এর কোন প্রতিক্রিয়া হল না। না হবারই কথা। কারণ, লেখক অত্যন্ত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অতএব মানবিক কোমল বৃত্তিগুলো যে নিতান্তই অসার তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। হরদয়ালের এই ভাবলেশহীন আচরণের কৈফিয়ৎ লেখক অবশ্য আগেই দিয়ে রেখেছেন। পরিচ্ছেদের গোড়াতেই তিনি লিখে রেখেছেন – পিতৃত্ব অভিধা মিথ্যা! কী অসাধারণ, অভিনব নতুন চিন্তা!

আরেকটি গল্প 'খানাতল্লাসী'তে সুধাকান্ত ও অলকাকে নিয়ে গল্পটি শেষ দিকে অনেকটা দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু ওই যে আগেই বলেছি, লেখকের তা অভিপ্রেত নয়। তাই দেখি, এক টুকরো আলোর অভাবে দুজনেই অন্ধকার ঘরে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বসে রইলো। আর লেখক মার্কসীয় পদ্ধতিতে এক দুই তিন করে যে ছয়টি কারণে সুধাকান্তের জীবনে এই অপরিহার্য পরিণতি ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করে দেখান।

সংকলনের সব কটি গল্পই একই পদ্ধতিতে রচিত। বোঝা যায়, লেখক আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানা ত্রুটিবিচ্যুতিতে এবং বর্ণচোরা রাজনীতির প্রতি অশেষ ঘৃণা পোষণ করেন এবং সাধারণ মানুষের এই জীবন-যন্ত্রণায় তিনি কাতর এবং ক্ষিপ্ত। তার এই মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠা নেই।

তবুও সবিনয়ে বলি, সাহিত্যের আসর আর রাজনীতির চোরাবাজার এক নয়। সাহিত্যে রাজনীতি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই থাকা উচিত। তার বেশীর কোন মূল্য নেই। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'কেও যথেষ্ট পরিমাণে সাহিত্যগুণমণ্ডিত হতে হয়েছিল। অলমিতি বিস্তরেণ। □

সুবচনী

গুলশন – পরেশ ভট্টাচার্য
নাথ পাবলিশিং, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭৩
দাম ১৮.০০ টাকা

তৃপ্তিকর ভ্রমণ কাহিনী

কাশ্মীর ভূখণ্ড প্রকৃতই এক চিরনবীন চির-বসন্তের। ঐ ভূখণ্ডের মানুষ, প্রকৃতি বার বার ভ্রমণপিপাসুদের কাছে টানে। মনোলোভা প্রকৃতির টানে ভ্রমণবিলাসী মানুষ তথাকার জনপদবাসীর আতিথ্য, আন্তরিকতার বাঁধনে বাঁধা পড়ে। সুখ দুঃখের মিশ্ররাগের বর্ণময় বিচিত্র ইতিহাস তাকে পদে পদে চমকে দেয়। লেখকের কাশ্মীর সফরের অভিজ্ঞতা এমনই। অনুভবী লেখক পরেশ ভট্টাচার্য তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন এই মনোরম কথা-কাহিনী 'গুলশন'।

ডাল লেকে শিশরায় ভ্রমণ, শালিমারবাগ, নিশাতবাগ, রুক্ষ অথচ সুন্দর সোনমার্গের আত্মস্থ প্রকৃতি, পরিপাটি পার্বত্য অধিত্যকা পহলগাঁও-এর মতো কাশ্মীরের প্রতিটি ভ্রমণ কেন্দ্র তাঁর বর্ণনার গুণে স্বয়ং পাঠককে ঐ সব মনোরম পরিবেশে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। কাশ্মীরের কিংবদন্তী, লোক ইতিহাসের খণ্ড কথা, লেখকের সঙ্গে কাশ্মীর কন্যা গুলশনের স্নেহময় প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক, রাবেয়ার সকরুণ পরিণতি, কাশ্মীরে বেড়াতে আসা শুভঙ্কর, মিস্টার বাজপেয়ী, কাশ্মীর ভূখণ্ডে প্রবেশকালে ট্রাক ড্রাইভার প্রীতম সিং-এর সঙ্গসুখের কাহিনী টুকরো হীরক খণ্ডের মতো ছড়িয়ে রয়েছে গ্রন্থের পাতায় পাতায়। এই টুকরো টুকরো কাহিনী-কথামালায় সাজানো 'গুলশন' সত্যিই এক তৃপ্তিকর পঠনীয় ভ্রমণ কাহিনী। অবশ্য আমরা এ গুলশন পড়ে কবি যোশের মতো বলতে পারবো না – গুলশন কি রাবিশ পে মুস্করাতা হুয়া চল। এ গুলশনের পায়ে হাটা সরু পথে, আধুনিক রাজপথে ছড়িয়ে আছে যে হাসি কান্নার কাহিনী, সে কাহিনী কেবল হাসায় না, কাঁদায়ও।

এক একটি ভ্রমণ কেন্দ্র ও সেইসঙ্গে সেখানকার মানুষের কাহিনী শুরু ও শেষ লেখকের কলম গুণে সর্বত্র মিলে গেলেও, বন্ধু শুভঙ্করের কাহিনীর ক্ষেত্রে মেলে নি। তাতে কাহিনীর গতি আচমকা ব্যাহত হয়েছে। কোন কোন স্থানে লেখক নিছক গাইডের মতো বর্ণনা করে গেছেন। সে সব জায়গায় বইটিকে নিছক ভ্রমণের গাইড বুক বলে মনে হয়েছে। স্থানে স্থানে 'ক্রোড়দেশ', অবলোকন-এর মতো শব্দের ব্যবহার গদ্যের গতি মন্থর করেছে। মোটা হরফে ছাপা, মুদ্রণ প্রমাদবিহীন এ বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ ইন্দ্র দুগারের মনোরম প্রচ্ছদ। □

অর্ঘ্য দাশ

'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে দু'খানা করে নতুন প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য লেখক বা প্রকাশককে জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদার ডায়েরি

২৮.৬.৮৫

আজ রাত্রে একটা দরকারে খড়গপুর থেকে বম্বে মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়লাম। কি জানি কেন, ট্রেনটা খুব ফাঁকা ছিল। কামরার একধারে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন, এ কোণে ও কোণে আরও দুতিনজন।

প্রথম দুজনকে বাঙালী দেখে তাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়লাম। গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তে পরিচয় হয়ে গেল। প্রবীণতর যিনি তাঁর নাম কুম্ভনীল সিংহ, অন্যজন হলেন সামঞ্জস্য দত্ত। নাম দুটিতে অভিনবত্ব আছে। পেশায় দুজনেই চিকিৎসাবিদ -- সার্জন। দুই বন্ধু বোম্বাই চলেছেন বিশেষ একটা কাজে। প্লেনে বা শীততাপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় জায়গা না পেয়ে অগত্যা এই গাড়িতে। আমার নাম গোপাল শুনে ভারি খুশী -- ওঁদের দুজনের বাড়িতে গোপালের নিত্যপূজা।

কুম্ভের হাতে কলম এবং ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লের পাতা। সামঞ্জস্য একটা ফাইলবন্দী থিসিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। কুম্ভবাবুকে দেখে খুব গম্ভীর এবং অতিরিক্ত রাশভারী বলে মনে হল আর বুঝলাম সামঞ্জস্যবাবু অত্যন্ত স্মার্ট ও বেশ আমুদে লোক। চিকিৎসাবিদ্যা পেশা হলেও খানিকক্ষণ কথাবার্তার পরেই টের পাওয়া গেল বিশ্বের তাবৎ বিষয়ে এঁদের প্রভূত জ্ঞান।

আর একটা ব্যাপার দেখলাম -- সামঞ্জস্য যেন প্রতি দু মিনিট অন্তর কুম্ভকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত। বেশ বোঝা গেল এটা ওঁর ম্যানিয়া। ভালই লাগছিল অবশ্য। যাই হোক ওই দুই মহাশয়ের সংগে বাক্যালাপে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলাম।

আলাপ-আলোচনায় জানা গেল সর্ববিষয়ে পুরোমাত্রায় উপলব্ধি হয়েছে বলেই কুম্ভবাবু চুপচাপ, স্বল্পভাষী থাকাটাই পছন্দ করেন।

জানেন মশাই , সব দেখে শুনে, যা বুঝবার বুঝে একেবারে চুপ করে গেছি , কিছু আর বলতে চাই না -- কুম্ভবাবু বললেন।

বাস, সেই যে সিংহমশায় কথা শুরু করলেন সেই কথকতা অনর্গল চলল, আমি ঘড়ি দেখে নিলাম। মোট তিন ঘন্টা ওঁদের সংগে থাকতে হয়েছিল, কারণ ট্রেনটা মাঝপথে কয়েকবার আটকে আটকে গিয়ে বেশ খানিকটা দেরি হল। এই তিন ঘন্টার মধ্যে কুম্ভ কথা বললেন হিসাবমত প্রায় দু ঘন্টা। সামঞ্জস্য প্রথম প্রথম ঠেস দিয়ে সিংহকে একটু কায়দায় পেলেও পরে কথার তোড়ে পুরোপুরি ভেসে গেলেন। শেষের দিকে একবার ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, সত্যেন দত্তকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, তাও টিকল না সিংহের বাক্যস্রোতে।

কুম্ভবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন, যদি আপনার খুব কাজ না থাকে, চলুন না আমাদের সংগে বোম্বে পর্যন্ত। খরচের জন্যে ভাববেন না।

আমার চেহারা দেখে সম্ভবত বাউন্ডুলে ভেবেছেন ওঁরা। আমি সবিনয়ে ওঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম। ২৮ জুনের পাতা শেষ হল।

২৯.৬.৮৫

অনেক দামী কথা ভুলে গেলেও এইবার স্মৃতি থেকে কুম্ভবাবুর সংগে কথোপকথনের সারাংশ উদ্ধার করে ডায়েরিতে তুলে রাখছি :

কুম্ভ : বাঙালী কবে পরাধীন হল বলতে পারেন ?

উত্তর হাতড়াতে লাগলাম।

কুম্ভ : পনেরোই আগস্ট উনিশশো সাতচল্লিশ। বিদেশী রাজত্বে বাঙালী কিন্তু দীর্ঘকাল পরাধীন হয়েও স্বাধীন ছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভাগ্যচক্রে বাঙালীর পরাধীনতা শুরু হল। বুঝতে পারছেন, না ব্যাপারটা খুলে বলব ?

বললাম : হ্যাঁ, পারছি।

কুম্ভ : পঁচাশি-ছিয়াশি ফিনান্সিয়াল ইয়ারে কদিন মাছ খাব বলুন তো ?

-- জানি না।

কুম্ভ : আমি আমার কথাই বলছি। এপ্রিল টু জুন খেয়েছি তেরো দিন, সপ্তাহে একদিন হিসাবে। যা দাম হয়েছে মাছের, চল্লিশ টাকা কিলো ! রোজগার বেশি হলেও রুচিতে বাধে। জুলাই টু মার্চ উনচল্লিশ সপ্তাহে আরও উনচল্লিশ দিন, প্লাস সারা বছরে বিয়ে বাড়ি যাব দশ দিন -- মানে অ্যাভারেজ একটা ঠিক করা আছে, মোটামুটি টেন পার্সেন্ট আর কি ! সব মিলিয়ে টোটাল আন্দাজ বাষট্টি দিন মাছ খাওয়া হবে। বাকি প্রায় তিনশো দিন মাছ খাব না বা খেতে পাব না। পেটের গোলমাল, শরীর খারাপ ইত্যাদি তো আছেই তা ছাড়া কাকা কাকী জেঠা জেঠী মিলিয়ে যে কটি পাকা আমের মত আছেন, টুপ টুপ করে খসে গেলেই এক এক দফায় পনেরো দিনের ধাক্কা -- মাছ বন্ধ। অ্যাজ এ রেজাল্ট দুঃখও কম হবে। যাক, আপনার অ্যাকাউন্টটা বলুন তো, আমার হিসেব ফলো করে কদিন মাছ খাবেন ?

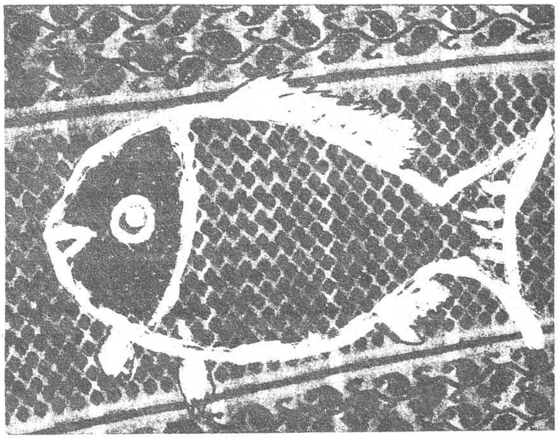

ভাবতে শুরু করেছি এই সময় সামঞ্জস্য কুট করে বলে উঠলেন, আরে গোপালবাবু, ও মাছ মাছ করছে, মাছ তো খায়ই না। চিকেন ছাড়া ওর --

সিংহগর্জন হল : পঞ্চাশ সালে ইন্ডিয়ার কোল আউটপুট কী ছিল ? চায়নার কী ছিল ?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

কুম্ভবাবু : শুনুন, পঞ্চাশ সালে ইন্ডিয়ার ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টন, চায়নার ত্রিশ লক্ষ টন। তিরাশি সালে ইন্ডিয়ার একশো তেতাল্লিশ লক্ষ টন, চায়নার এক হাজার লক্ষ টনেরও বেশি। তফাতটা দেখছেন, রেট অব প্রগ্রেস কেন এমন হল বলতে পারেন ? ইন্ডিয়া কি এতই একটা মেয়েমানুষের রাজত্ব হয়ে গেল যে মেয়েলি...

সামঞ্জস্যের ইন্ট্যারাপশন : হিসেবটা ঠিকই বলেছো, কিন্তু মেয়েমানুষকে আর তুমি অন্ততঃ গালিগালাজ করার চেষ্টা করো না। তোমার যা কান্ড !

আবার সিংহগর্জন : অ্যাই চোপরও, ঠিকমত না জেনে কিছু বলবে না।

এখানে ২৯ জুনের পাতাও শেষ হয়ে গেল।

৩০.৬.৮৫

ট্রেনটা ঘাটশীলা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমার মস্তিষ্কে প্রোটন পজিট্রন নিউট্রন ইলেকট্রনের তান্ডবলীলা চলছে। এ কোন্ পাল্লায় এসে পড়লাম ঠাহর করতে পারছি না।

কুম্ভনিনাদ : রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা স্মরণ করুন। সেই সোনার বাংলা আজও আছে কী ? আস্তে আস্তে সব সোনা কারা যেন খসিয়ে নিয়ে গেল, এখন দেখছি সবটাই গিলটি হয়ে গেছে ! মশাই প্রাণপণে কষ্টিপাথরে ঘষে দেখছি, খাঁটি গিলটি। কিন্তু সোনাটা গেল কোথায় ? কোন্ ব্যাস্টার্ডের দল সোনাটুকু চেঁছে নিল তাই তো আমাদের জানা দরকার। পার্টি, রুলিং পার্টি, মেট্রো রেল, সি. এম. ডি. এ. -- এদের ধরলে এরা নিজেদের নট গিলটি বলবে, কাকে ধরব ?

সমস্ত নার্ভের গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, কোনমতে বললাম : আপনি পিটার দি স্কটের স্টাইলে কথা বলছেন --

সামঞ্জস্যবাবু সংগে সংগে বাধা দিলেন : স্কট নয়, পিটার দি গ্রেট বলুন। বি স্টেডি।

এইবার কুম্ভবাবুর একটু ভাবান্তর লক্ষিত হল। রুমালে ঘাম মুছে ফ্ল্যাস্কের ঢাকা খুলে সেটার মুখে স্বল্পস্থায়ী একটা চুম্বন করলেন। ক্ল্যাসিকের একটা স্টিকে অগ্নিসংযোগ হল। বাক্যজালের পর ধূম্রজাল !

গোল্ডরাশে চার্লি চ্যাপলিনের মত হেঁচকি উঠতে লাগল আমার। কোনমতে সামাল দিয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ দেখি কি একটা ঝোঁকে পরম পরিতৃপ্তিতে সিগারেট টানতে টানতে কুম্ভবাবু ক্রসওয়ার্ডের পাতায় মনঃসংযোগ করেছেন।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল একদম চুপচাপ। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি পেশায় চিকিৎসক হয়ে এঁরা রাজনীতি সমাজবিদ্যা সাহিত্য ধর্ম বিজ্ঞান -- এত সব দুরূহ তত্ত্ব আয়ত্ত করলেন কী করে ? সময়ই বা পান কিভাবে ? কয়লা উৎপাদনের তথ্য পর্যন্ত এঁদের মুখস্থ ! এত কথা কুম্ভবাবু বললেন, খেই হারিয়ে কেমন গোলমাল হয়ে গেল, সব এখন মনে পড়ছে না। ডায়েরিতে অনেক কথা বাদ গেল।

সিংহমশায় আবার জাগ্রত হলেন : এবার আসুন, মেট্রো রেলের কথাই ধরা যাক। এই যে ছশো কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হল তার মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড আর -- ট্রেনটা থামবে বলে মনে হচ্ছে, কোথায় এলাম ?

ব্রিফ কেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুম্ভবাবুকে বললাম : আপনার কাছে এতক্ষণ বসে কতরকম বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করলাম তার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। বিশেষ করে ওই মাছের থিয়োরিটা খুব ভাল লাগল। আর কেউ বলে কি না জানি না, আমি আপনার পদবি সিংহের সংগে সম্মানজনক 'মামা' যোগ করে সিংহমামা বলে প্রণতি জানাচ্ছি।

কুম্ভনীল এবং সামঞ্জস্যকে বললাম : আমার গন্তব্যস্থল টাটানগর এসে গেল। এবার শুয়ে পড়ুন, বিশ্রাম দরকার। আপনারা তো অনেকটা দূর পথ যাবেন, বহু ভাগ্যে আপনাদের সহযাত্রী হতে পেরেছি, অল্প পথের সংগী। আবার দেখা হবে। আচ্ছা নমস্কার। ◻

[প্রায় মাসখানেক যাবৎ গোপালদার দেখা না পাওয়ায় কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার ফ্ল্যাটে হানা দিলাম একদিন। দরজা উন্মুক্ত, কর্তা বাথরুমে। টেবিলে খোলা ডায়েরি। গোপালদা কাহাকেও ডায়েরি পড়িতে বা ছুঁইতে পর্যন্ত দেন না। গোপনে পড়িয়া ফেলিলাম। ২৮, ২৯ ও ৩০ জুনের পাতা তিনটি নিপুণভাবে খুলিয়া চুপি চুপি কাটিয়া পড়িলাম। ছাপিলে নিতান্ত মন্দ হইবে না। কিছু পাঠক অবশ্য খুশী হইবেন। শনিবারের চিঠিতে ছাপা হওয়ার পর গোপালদা মারুন কাটুন যাহা হইবার হউক।]

কলকাতা : এ কি প্রাসাদের শহর, না আবর্জনার শহর ? ছবি – শিখর কর্মকার

SANIBARER CHITHI □ VOL. 1 NO. 38 □ JULY 13 Regn. No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram : CENTPILES, Telex : CENT IN CA-021-2331
Phones : 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84